"বই মনের খাদ্য।
বেশি বেশি বই পড়ুন,
মনকে সুস্থ রাখুন।।"

মোঃ কবিরুল ইসলাম
(DMC K-69)

www.facebook.com/kabiruldmc

kabirul.dmc@gmail.com

ও সংস্কৃতি
এ কথা কখনও ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি—যে ভারতীয় নারীর অঙ্গে যে শাড়ী শোভা পায় তাহা শুধু সুন্দর অঙ্গাভরণ নহে—তাহা ভারতীয় সংস্কৃতির একটা প্রধানতম বৈশিষ্ট্য।
বহু প্রাচীনকাল হইতে এই আধুনিক ভারতনারীর যুগ পর্য্যন্ত যুগে যুগে ভারতের শিল্পীরা ভারতবর্ষের এই সাংস্কৃতিক রূপকে শ্রীতে, সৌন্দর্য্যে ও শোভায় ক্রমবর্দ্ধিত করিয়া আসিয়াছেন।
সেই শিল্পধারার চরম উৎকর্ষের সর্ব্বজন-স্বীকৃত নিদর্শন হইল ইণ্ডিয়ান সিল্ক হাউসের—নানা বর্ণের, নানা বৈচিত্র্যের ও নানা ডিজাইনের শাড়ী। ইহার প্রত্যেক বর্ণবিন্যাস ও বিভিন্ন ডিজাইনের পশ্চাতে আছে শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের পরিকল্পনা।
ইণ্ডিয়ান সিল্ক হাউস
টাওয়ার ব্লক • কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা • ফোন-বি.বি.

জ্যৈষ্ঠ—১৩৬২

সম্পাদক

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

এই গ্রন্থে আছে

এই গ্রন্থে আছে

●

এই গ্রন্থে আছে

●

এই গ্রন্থে আছে

এই গ্রন্থে আছে

এই গ্রন্থে আছে

এই গ্রন্থে আছে

ভেষজ-বিশারদ
নগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রীর
অনবদ্য অবদান
'হিমকল্যাণ'
কেশ তৈল
গুণে, গন্ধে
ও
রূপরচনায়
অপরাজেয়
হিমকল্যাণ ওয়ার্কস লিঃ
কলিকাতা

দশম বর্ষ
১২শ সংখ্যা

জ্যৈষ্ঠ
১৩৬২

বিশ্ব-উত্তেজনা ও ভারত

সম্প্রতি দিল্লীতে এক সাংবাদিক বৈঠকে বিশ্ব পরিস্থিতি সম্বন্ধে পর্যালোচনা কালে ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু বলেছেন যে, বর্তমানে বিশ্ব-উত্তেজনা কিছু উপশমিত হয়েছে, বিশ্ব-মনোভাব উত্তরোত্তর যুক্তি-প্রিয় হয়ে উঠছে, সুতরাং বিশ্বে অধিকতর আশার আলোক দেখা দিয়েছে।

কথাটা উৎসাহোদ্দীপক, এবং বিশ্বমাতব্বরদের সাম্প্রতিক বচন-বাচন এবং আচরণাদি থেকে মনে হয় তেমন অযথার্থও নয়। এমন কি এই বিশ্ব-উত্তেজনা মোক্ষণে ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুকে পুরোধা করে ভারতবর্ষের বিশেষ কিছু কৃতিত্ব আছে এমন কথা শুধু আমরা ভারত-বাসীরাই নয়, বহির্জগৎও কতকটা বিশ্বাস করতে আরম্ভ করেছে। গত ৩১শে মে ওয়াশিংটনের প্রসিদ্ধ পত্রিকা 'ইভনিং ষ্টার' মন্তব্য

করেছে, 'শ্রীনেহরু মানব-স্বাধীনতার রক্ষক ; দূর প্রাচ্যের অধিবাসিগণ মার্কীয় সৈন্যসমাবেশ এবং পুলিশী সন্ত্রাসবাদ নীতির দ্বারা পরিচালিত চীন অপেক্ষা গণতান্ত্রিক আদর্শে অনুপ্রাণিত ভারতের আদর্শ অনুসরণ করলে অধিকতর কল্যাণ লাভ করবে।'

এ শুধু আমেরিকার 'ইভনিং ষ্টারই' নয়, অশোক-চৈতন্য-গান্ধী-রবীন্দ্রনাথ-মহিমান্বিত উপনিষৎ-বেদান্তসমাহিত প্রাচীন ভারতবর্ষ একদিন তার অধ্যাত্ম-সর্ষপের দ্বারা বিশ্বের হিংসাভূতকে অপসারিত করে বিশ্বকে শান্তিমন্ত্রে দীক্ষিত করবে, এই রকম একটা আশ্বাস বিশ্বের আকাশে-বাতাসে প্রচারিত হতে আরম্ভ করেছে, এবং তার দ্বারা আমরা আত্মপ্রসাদে বিভোর হয়ে খানিকটা গম্ভীর হতে আরম্ভ করেছি।

পরকে যদি ভোলাই ত স্বতন্ত্র কথা, কিন্তু এর দ্বারা নিজেকে যদি ভোলাই তা হলে তা হয় একান্তই আত্মপ্রবঞ্চনা। যে সর্ষপের দ্বারা বিশ্বের ভূত ছাড়াবার দর্প আমরা করি, রাজ্য-পুনর্গঠন কমিশনের পরিক্রমা-কালে সেই সর্ষপের মধ্যেই বিহার উড়িষ্যা ও আসামের প্রত্যন্ত দেশে হিংসা ও প্রাদেশিকতা ভূতের যে তাণ্ডব দেখা গিয়েছিল, তার উত্তেজনা রাশিয়া ও আমেরিকার মধ্যে বর্তমান উত্তেজনার অনুপাতে এমন কিছুই কম নয়। তফাৎ এইমাত্র, সেখানে আণবিক বোমার আস্ফালন, এখানে লাঠির। অর্থাৎ পার্থক্য শুধু পদ্ধতির।

সুতরাং ভারতকে বিশ্বের গুরুগিরি করতে উদ্যত দেখলে বলতে ইচ্ছে হয়, Physician, first heal thyself !

ওয়াশিংটনের 'ইভনিং ষ্টার' ভারতকে গণতান্ত্রিক আদর্শে অনুপ্রাণিত দেশ বলে সার্টিফিকেট দিয়েছে। কিন্তু যে দেশের গণসাধারণ গণতান্ত্রিক

পদ্ধতিতে গঠিত রাজ্য-পুনর্গঠন কমিশনের সিদ্ধান্ত প্রকাশ পর্যন্ত অপেক্ষা করবার ধৈর্য না রেখে লাঠি হস্তে বেরিয়ে এসে বলে 'বিনা রণে প্রতিবেশী রাজ্যকে সূচ্যগ্র ভূমি দান করব না,' সেই (অখণ্ড !!) ভারতকে গণতান্ত্রিক ব'লে প্রশংসা করি কমিউনিষ্ট চীনকে হেয় করবার সদভিপ্রায়ে। চোরকে ভদ্র বলার দ্বারা ডাকাতকে অভদ্র বলি।

এই প্রাদেশিকতা ভূত এতই উগ্র যে, ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের প্রস্তাবিত আসাম শুভেচ্ছা ভ্রমণকে 'বাহিরের হস্তক্ষেপ' আখ্যা দিয়ে সে তাতে আপত্তি উত্থাপিত করেছে। এ সম্পর্কে আসামের কংগ্রেসনেতা ও সংসদ-সদস্য শ্রীরোহিণীকুমার চৌধুরী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মতো ব্যক্তির বিরুদ্ধে এরূপ আপত্তিতে বিস্ময় প্রকাশ ক'রে বলেছেন, 'নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিই ডাঃ রায়ের আসাম পরিদর্শনের ব্যবস্থা করেছেন, ইহা কংগ্রেসেরই নির্দেশ।'

যে দেশের গণবিবেচনা দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের নির্দেশকে এতদূর অবজ্ঞা করতে পারে সে দেশকে আমেরিকার 'ইভ্‌নিং স্টার' গণতান্ত্রিক আদর্শে অনুপ্রাণিত দেশ বললে সত্যই কি সে কথা বিশ্বাস করতে হবে ?

এই সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় রোহিণীকুমার চৌধুরী যে মন্তব্য করেছেন তার আমরা সমর্থন করিনে। তিনি বলেছেন, 'ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের সীমানা পুনর্বিন্যাসের জন্যে রাজ্যপুনর্গঠন কমিশনকে তদন্ত ক'রে সিদ্ধান্তে উপনীত হ'তে দেওয়া ভ্রান্ত ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থা 'ঘুমন্ত সরীসৃপকে' গোষ্ঠীপ্রিয়তা ও প্রাদেশিক ঈর্ষায় জর্জরিত ক'রে তোলা ছাড়া আর কিছুই নয়। রাজ্য-সীমানা পুনর্বিন্যাসের ব্যবস্থা ত্যাগ করা কর্তব্য। এমন কি, রাজ্য-পুনর্গঠন কমিশনের রিপোর্টও প্রকাশ না করা কর্তব্য। আর, যদিও বা প্রকাশিত হয় তা'হলেও তা' গভর্মেণ্টের চেপে দেওয়া বিধেয়।'

এ নীতি দুর্বলের নীতি। যে প্রাদেশিকতাকে আমরা ভূত ব'লে আখ্যাত করেছি, সেই প্রাদেশিকতাকেই চৌধুরী মহাশয় সরীসৃপ বলেছেন। কোনোটাই ভাল নয়; একটা ঘাড় মটকায়, অপরটা ছোবল মারে। ফলে উভয়তঃই মৃত্যু।

ঘুমন্ত সরীসৃপকে ধামা চাপা দিয়ে রাখলে আমি হয়ত আজ বাঁচি, কিন্তু কোনো দিন ধামা খোলা পড়লে আমার বংশধরেরা বিষধরের দংশনে জর্জরিত হবে। তার চেয়ে হৃদয়দৌর্বল্য পরিত্যাগ ক'রে সরীসৃপকে অবিলম্বে নিহত অথবা নির্বাসিত করাই বিধেয়।

এর দ্বারা গণতন্ত্র-ধর্মের কোনো বিচ্যুতি ঘটে না। অমায়িক ভাবে ঘাড় হেঁট ক'রে হেঁ হেঁ করলেই গভর্মেণ্ট গণতান্ত্রিক হয় না। গভর্মেণ্ট মাত্রকেই শক্তিশালী হ'তে হবে, তা সে গভর্মেণ্ট কংগ্রেসই হোক্ অথবা কমিউনিস্টই হোক্। নির্বিষ সাপ আর নির্বীর্য গভর্মেণ্ট একই ভাবে উপায়হীন হতভাগ্য বস্তু। উভয়কেই ঢেলা খেতে খেতে প্রাণান্ত হ'তে হয়। কোনো এক মৌলিক পরিবর্তনের প্রস্তাব হলে জনসাধারণের এক অংশ ফোঁস ক'রে উঠলেই যদি নির্বিচারে সরীসৃপকে ধামা চাপা দিতে হয় তা'হলে সে বন্ধ্যা গভর্মেণ্ট কোনো দিন কোনো সুফলই প্রসব করতে পারবে না।

শক্তিশালী এবং দুর্বল গভর্মেণ্ট সম্বন্ধে ইংরাজিতে দু'টি সুবিদিত বাণী আছে। প্রথমটি হচ্ছে—A strong government alone can assure its citizens; দ্বিতীয়টি People are oppressed when power is weak। এই দু'টি সারগর্ভ বাণী মনে রেখে চললে সরকারি এবং বেসরকারি উভয় শ্রেণীর নেতৃবৃন্দই উপকৃত হবেন।

সিংহলের প্রথম অনধিকার প্রবেশকারী

সিংহলের প্রধান মন্ত্রী স্যার জন কোটলেওয়ালা সম্প্রতি (১লা জুন) বলেছেন, আজ হ'তে আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে ভারত হ'তে সর্বপ্রথম এক ব্যক্তি বে-আইনিভাবে সিংহলে প্রবেশ করেন, আর সঙ্গে সঙ্গে সিংহলের ইতিহাসের সূত্রপাত হয়। এই প্রথম বহিরাগত একজনা বাঙালী।

সিংহলে নিযুক্ত ভারতীয় হাই-কমিশনার শ্রী বি. এন্. চক্রবর্তীকে সংবর্ধনা জ্ঞাপনের জন্য এক অনুষ্ঠানে স্যার জন ভারত-সিংহল সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে ভারতীয় হাই-কমিশনারের সহযোগিতা কামনা ক'রে শ্রীচক্রবর্তীকে বলেন, 'আপনি বাঙালী। আপনার প্রদেশের লোকই বে-আইনী ভাবে সর্বপ্রথম সিংহলে আসেন। তিনি রাজকুমার বিজয়। পাঁচ শত অনুচর নিয়ে এখানে এসে তিনি সিংহলী সভ্যতার সূচনা করেন।'

বাংলার বর্তমান অবনয়নের যুগে স্যার জন কোটলেওয়ালার এই বিবৃতি বাঙালী যুবকের অন্তরে যেন আত্মপ্রত্যয় বর্ধিত করে।

দুর্গাপুর কোক-চুল্লী

পশ্চিম বঙ্গের পশ্চিম ভাগে অবস্থিত দুর্গাপুরে সাড়ে পাঁচ কোটী টাকা ব্যয়ে একটি কোক-চুল্লী সংস্থাপনের পরিকল্পনা পশ্চিম বঙ্গ সরকার ভারত সরকারের নিকট পেশ করেছিলেন। সরকারি ভাবে জানা গিয়েছে যে, ভারত সরকার পশ্চিম বঙ্গ সরকারের উক্ত পরিকল্পনাটি মোটামুটি ভাবে অনুমোদিত করেছেন।

ভারত বিভাগের ফলে পশ্চিম বঙ্গ পূর্ব আয়তনের এক-তৃতীয়াংশে খর্বীভূত হয়েছে ; জনসংখ্যা সে পরিমাণে হ্রাস পায়ই নি, উপরন্তু পূর্ব বঙ্গ

হ'তে অবিরত উদ্বাস্তু আমদানির ফলে অনেক বৃদ্ধি লাভ করেছে। অথচ নানা কারণে, তন্মধ্যে পশ্চিম বঙ্গের শ্রমিক সমস্যার অত্যুগ্রতাই বোধ হয় সর্বপ্রধান, বহু সরকারি এবং বে-সরকারি কলকারখানা ও অফিস পশ্চিম বঙ্গের বাইরে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং হচ্ছে। এই সকল কারণে পশ্চিম বঙ্গে বেকার সমস্যা অতিশয় তীব্র আকার ধারণ করেছে।

দুর্গাপুরের কোক-চুল্লী এই বেকার সমস্যা কথঞ্চিৎ লাঘব করতে সক্ষম হবে; বিশেষতঃ যখন উপজাত স্বরূপ অ্যামোনিয়া, সালফিউরিক অ্যাসিড, আলকাতরা, বেনজল প্রভৃতি উৎপাদনের জন্য কারখানা, এবং একটি আলকাতরা শোধন কারখানাও এই কোক-চুল্লীর সহিত স্থাপনের পরিকল্পনা আছে।

—"সংসারে কি সুখ আছে? এই আছে, এই নাই। সংসার বিষের গাছ। বিষে জেরে ফেলে। তবে যারা সংসার করে ফেলেছে, তারা আর কি করবে! বুঝতে পেরেও কিছু করতে পারে না। সংসার অনিত্য। সংসারে যত লিপ্ত না হওয়া যায় ততই ভাল।" —শ্রীশ্রীমা

গল্প ? না, গল্পের ছলে—?

শ্রীদিলীপকুমার রায়

সেদিন যা ঘটল খানিকটা অভাবনীয় না ব'লে উপায় কি ? নিউইয়র্কের এক মস্ত বণিক্-হলে গাইল অসিত ও নাচল তপতী। এ-হলে ফী মাসে নাকি বসে শান্তিসভার বৈঠক—মানে অশান্তরা করেন শান্তির জন্যে হাজারো বিতণ্ডা, বলেন খাসা খাসা কথা—সাক্ষাৎ ঈশার বাণী : "Blessed are the meek : for they shall inherit the earth…Blessed are the peace-makers : for they shall be called the children of God" ইত্যাদি। এ-হেন হাটে নৃত্য-গীত ? তবে যাঁর ইচ্ছায় কর্ম সেই ক্রোরপতি কর্তা যখন নিজে এগিয়ে এসে দায়িত্ব নিলেন, বললেন টেবিল চাপড়ে : "মনে শান্তি আনতে নৃত্যগীতের মতন দূতী—বুঝলে কিনা ?"—তখন বাকি সবাই জয়ধ্বনি ক'রে বলবেন না কেন : "হ্যাঁ তা বটেই তো, তা বটেই তো !"

পরিণাম—অনুমেয় : শান্তিবাদীরা ঘটা ক'রে শিল্পের শান্তি-সভা বসালেন তর্ক-জল্পনার কুরুক্ষেত্রে। গানান্তে একটি কাফেতে ব'সে শিষ্যা তপতী বলল গুরু অসিতকে : "একটা কাজের মতন কাজ হ'ল বটে—এদেশে এসে এদের নিয়ম-ভাঙা, ভাবো দাদা !"

শ্রীমতী বার্বারা ছিল পাশে—তখনো ইতালি যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছে। কফির পেয়ালায় শেষ চুমুক দিয়ে পাত্রটি সরিয়ে রেখে হাসি-মুখে বলল : "কিন্তু শুধু গানই তো নয়, দাদা ! টুক্ ক'রে কেমন

শঙ্করাচার্যের সম্বন্ধেও বেশ দু-কথা ব'লে নিলেন! দাদার উপস্থিত-বুদ্ধি আছে।"

অসিত হেসে বলল: "মন্দের ভালো। সাংসারিক বুদ্ধি যার লুপ্তপ্রায়—অন্তত আমার সুবুদ্ধি বন্ধুরা এ-বিষয়ে সবাই একমত—তার একটু উপস্থিত বুদ্ধিও যদি না থাকে—তবে সে বেচারি ক'রে খায় কার জোরে?"

বার্বারা টপ্ ক'রে বলল: "আমাদের দার্শনিক এমার্স'ন বলেছিলেন একটি লাখ কথার এক কথা: "সব ক্ষতির উল্টো পিঠেই একটা না একটা ক্ষতিপূরণ থাকে।" ব'লেই গম্ভীর হ'য়ে বলল: "কিন্তু আমার মনে একটি প্রশ্ন জাগছে দাদা! আপনি শঙ্করাচার্যের 'শিবোহং শিবোহং' গাইবার আগে আপনার ভূমিকা-ভাষণে বলেছিলেন যে, এ-ধরণের উপলব্ধি যাঁদের লাভ হয় তাঁরা সেই সঙ্গে লাভ করেন এক পরম নিশ্চিন্তি যার মূলে আছে এই নিশ্চিত প্রত্যয় যে, ভগবান তাঁদের ভার নিয়েছেন পুরোপুরি। আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, এ-কথার স্বপক্ষে জীবনের কোনো এজাহার আছে কিনা—অর্থাৎ আপনি নিজে এ-রকম কোনো মানুষ চাক্ষুষ করেছেন কিনা যিনি শুধু যে বিশ্বাস করেন যে ভগবান তাঁর সব ভার নিয়েছেন তাই নয়—নিজের জীবন সে-বিশ্বাসের কাছে সমর্পণ ক'রে ভগবানের কৃপায় উত্তীর্ণ হয়েছেন নানা সংকটে—শুধু এক-আধবার নয়—দৈনন্দিন জীবন-যাত্রায়।"

অসিত একটু হেসে বলল: "তোমার প্রশ্নটা সোজা হ'লেও উত্তর দেওয়া নয়। কারণ যদিও এ-রকম সাধু আমি দেখেছি একাধিক ও পেয়েছি তাঁদের আশীর্বাদ, কিন্তু কৃপা কথাটা টেনে এনে তুমি যে সব ঘুলিয়ে দিলে। কেন না যে-শ্রেণীর এজাহারকে সাধুরা কৃপার দান ব'লে প্রত্যক্ষ দেখতে পান অপরে তাকে বলবে ভাববিলাস বা

যোগাযোগ—যাকে তোমরা চলতি কথায় ডিশমিশ ক'রে দাও অটো-সাজেস্‌চন বা কোয়েসিডেন্স ব'লে।"

বার্বারা বলল: "আমি নাস্তিবাদীদের কথা বলছি না দাদা, বলছি সেই জাতের মানুষের কথা—যাদের মধ্যে আমি পড়ি আশা করি—যারা বিশ্বাস করতে চায়—কিন্তু কিছুটা অন্তত চাক্ষুষ ক'রে—তবে। অর্থাৎ যারা বিশ্বাসে ভর করতে চায়—কিন্তু ধরুন পায়ের নীচে খানিকটা মাটি না পেলে—"

অসিত বলল: "ও! এবার বুঝেছি তোমার কোথায় বাধছে।" ব'লে তপতীর দিকে তাকিয়ে বলে: "কী? বলব নাকি ওকে শ্যামঠাকুরের কথা।"

তপতী সায় দিয়ে বলল: "বলো, কারণ ও সত্যিই জিজ্ঞাসু—ওর লাভ হবে।—হ্যাঁ হ্যাঁ—ও অবিশ্বাস করবে না—ভেবো না।"

*　　*　　*

অসিত কফির পেয়ালায় চুমুক দিয়ে বার্বারার দিকে চেয়ে একটু হেসেই গম্ভীর হ'য়ে বলল: "তোমাকে সেদিন বলেছিলাম অমল নামে এক তরুণ সাধকের কথা। আজ বলব এক প্রবীণ ভক্তের কথা। এঁর কথা আমি প্রথম শুনি অমলের কাছেই। তাঁর পুরো নাম—শ্যামলাল চক্রবর্তী—পাড়াগেঁয়ে ব্রাহ্মণ। কিন্তু তাঁর ভক্ত অনুরাগীরা তাঁকে ডাকত শ্যামঠাকুর ব'লে। অমলের কাছে তাঁর বিচিত্র জীবনের কিছু কিছু শুনে অবধি এ-নমস্য মানুষটিকে দেখবার জন্যে আমি উৎসুক ছিলাম। কিন্তু তাঁর নাম জানলেও ধাম জানা ছিল না। এম্‌নি সময়ে একদিন দেখা হ'য়ে গেল একেবারে হঠাৎ—কী ভাবে বলি।"

থেমে কফিতে চুমুক দিয়ে অসিত একটু ভাবে, তারপর বলে: "নাঃ, বাদ দেব না—গোড়া থেকেই সুরু করি।

"হ'ল কি, কাশীতে হিন্দুমহাসভার এক অধিবেশনে আমার নিমন্ত্রণ এল—গাইতে হবে ভজন। আমি ধরলাম প্রথমে তুলসীদাসের বিখ্যাত ভজন :

'তু দয়াল—দীন হুঁ, তু দাতা—ময় ভিখারী।
ময় প্রসিদ্ধ পাতকী—তু পাপপুঞ্জহারী।'

সে সময়ে মনটা ছিল বৈরাগ্যের উঁচু তারে বাঁধা। গুরুদেব স্বামী স্বয়মানন্দকে কাশ্মীরে তাঁর আশ্রমে সবে দর্শন ক'রে ফিরেছি। বাঁশি শুনেছি—'আয় রে আয়, সব ছেড়ে ভগবানের শরণ নে, ভয় নেই নেই নেই।' সাধ জেগেছে বৈকি—কিন্তু সাধ্য কই? ভয় করে যে! কাজেই শুধু আত্মগ্লানিই ওঠে কেঁপে। ক্ষতিপূরণ মিলল—গানে। যেই বুঝেই ফিরে আসি—কণ্ঠের সুরে মন দেয় দোয়ার—ঠাকুর, বলামই বা আমি পতিত—তুমি তো পতিতপাবন—জোর ক'রে টেনে নাও রাঙা পায়—আমি কি পারি? ফলে বুকে জেগে ওঠে ভাব, চোখে জল। নিজের দুরবস্থার কথা ভেবে যে এত সুখ পাওয়া যায় কে জানত?

"গান শেষ হ'তে না হ'তে তুমুল জয়ধ্বনি—আর একটা, আর একটা! পাশের এক গম্ভীর সাধু বললেন: 'একটি গুরুবন্দনা গাইবেন?' আমি ধ'রে দিলাম মীরা-ভজন :

'গুরুচরণনসঙ্গ লাগী মীরা রাতী রঙ্গ কনহাঈ।
জনম জনমকী টুটী প্রভুসঙ্গ সৎগুরু আন মিলাঈ॥'

যত গাই মনে পড়ে গুরুদেবের প্রশান্ত উজ্জ্বল মুখ। ফিরে ফিরে গাই ধুয়ো—জন্মে জন্মে যাঁকে চেয়েছি অথচ পাইনি—সেই হারিয়ে-যাওয়া হরির রঙে কবে মনপ্রাণ উঠবে রঙিয়ে—গুরুর প্রসাদে?

"গানের পর সেই সাধুটিই উঠলেন বক্তৃতা দিতে। মাঝপথে আমি

উঠে চ'লে এলাম। কেবলই মনে হয়—'কথা কথা কথা!—বস্তুলাভ হবে কবে?'

"বাইরে আসার পথে শাদা-কাপড়-পরা সৌম্য-মূর্তি একটি মানুষ আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন। বয়স চল্লিশ হবে—চোখভরা জল, এসেই আমার দু-হাত চেপে ধরলেন: 'আহা কী গানই গাইলে ভাই!—ভাগ্যবান তুমি—একটু ভাব করতে চাই তোমার সঙ্গে—যদি রাগ না করো—তাছাড়া তোমার সময় হবে কি?' মানুষটির সরল হৃদ্যতায় আমি মুগ্ধ হ'য়ে গেলাম। কুণ্ঠিত হেসে বললাম: 'বিলক্ষণ! আমি কী এমন রাজকাজে ব্যস্ত—' তিনি বললেন: 'না, না, তুমি ব্যস্ত নও তো ব্যস্ত কে? কত জায়গায় তোমার ডাক—তোমার খবর আমি কিছু রাখি যে ভাই! অমল আমাকে মাঝে মাঝেই লিখত।"

'অমল! তাকে আপনি জানতেন?' তিনি হেসে বললেন: 'বিলক্ষণ! তার মা ছিল আমার জেঠতুত বোন।' আমি উৎফুল্ল হ'য়ে বললাম: 'বাঃ! তবে চলুন বাইরে কোথাও বসা যাক। এখানে আর টিঁকতে পারছি নে। যে গরম! তার উপরে লাউড স্পীকারে গীতার 'তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী' পাঠ—মৌনীই বটে, বলুন তো রক্ত-মাংসের শরীর তো!"

"ভদ্রলোক হা হা ক'রে হেসে উঠলেন—প্রাণ-খোলা হাসি: 'যা বলেছ ভাই! তাছাড়া এরা ভুল করে কোথায় বলব? বক্তৃতা যদি দিতেই হয় তবে দে না বাবা, গানের আগে। গানের পরে কি বক্তৃতা জমে? পরমহংসদেব কী বলেছিলেন মনে নেই—যখন গিরিশ-বাবু তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন চৈতন্যচরিতের পর বিবাহ-বিভ্রাট অভিনয় দেখবেন কি না?—'এ কী করলে? পায়েষের পর নিমঝোল!' হা হা হা!'

"কী চমৎকার যে লাগল তাঁর সেই মুক্ত হাসি—অথচ তখনো সেই গুরুবন্দনার গান শুনে উথলে-ওঠা চোখের জল শুকিয়ে যায় কি !

"কিন্তু ততক্ষণে আমরা সোজা রাস্তায় নেমে এসেছি। কোথায় বসা যায় ?—এদিক ওদিক চাইছি একটা চায়ের দোকানের খোঁজে, এমন সময়ে তিনি ভাবগ্রাহী জনার্দনের মতনই টুপ্ ক'রে বললেন: 'আমার বাসা এই মোড়টার পরেই—আসবে ? ঐ বেলা পাঁচটা বাজছে ঢং ঢং ক'রে—বলি, একটু চা হ'লে কেমন হয় ? খাও তো ?'

"আমি একগাল হেসে বললাম: 'বিলক্ষণ ! জানেন দাদা, আমি বিখ্যাত ডি. এল. রায়ের চা-স্তুতি করি ত্রি-সন্ধ্যা ?' ব'লেই গুন গুন ক'রে ধ'রে দিলাম:

'অসার সংসার, কে বা বলো কার—দারা সুত বাপ মা ?
(এ) অসার জগতে যাহা কিছু সার—সে ঐ এক পেয়ালা চা—চা—চা।'

"ভদ্রলোকের সে কী হাসি ! আমার পিঠ চাপড়ে বললেন: 'দুই ভাইয়ের এবার জমবে ভালো। বৈরাগ্যের সঙ্গে রসিকতা—যোগ্যং যোগ্যেন যোজয়েৎ, বলে না শাস্ত্রে ?'

"আমি পথ চলতে চলতে বললাম: 'বলে বটে, কিন্তু বৈরাগ্যের প্রসঙ্গটা আমার বেলা না তুললেই ছিল ভালো। শাস্ত্রে তো 'বৈরাগ্যমেবাভয়ম্'-ও বলে, কিন্তু আমার যে ও-অভয়ের কথা মুখে আনতেও ভয় করে দাদা—কী নাম দাদার—এবার বলবার সময় হ'ল !'

"তিনি বললেন: 'শ্যামলাল চক্রবর্তী।' আমি চম্‌কে উঠলাম: 'বলেন কি ? শ্যামঠাকুর আপনি ?'

'হা হা হা ! জানোই তো ভাই, আমাদের দেশের ভক্তদের কাণ্ড—কথায় কথায় ঠাকুর—অলিতে গলিতে অবতার ! তুমি আমাকে নাম ধ'রেই ডেকো।'

"আমি ব্যস্ত হ'য়ে তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে বললাম: 'অমন কথা ব'লে অপরাধ আর বাড়াবেন না। এমন সাধুর সঙ্গে কি না এতক্ষণ প্রগল্‌ভতা ক'রে এসেছি—না না দাদা, সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে, পুলিশ চেনে চোর। আপনি এক কথায় সব ছেড়ে আকাশবৃত্তি নিলেন—আর আমি সব জেনে শুনেও মিথ্যে সভায় সভায় গান গেয়ে বেড়াচ্ছি—কোথায় আপনি আর কোথায় আমি!'

"বলতে বলতে তাঁর বাসায়। ছোট্ট বাসা—মাত্র তিনটি ঘর। একটি শ্যামঠাকুরের পূজা-ঘর, একটিতে তাঁর স্ত্রী ও মেয়ে থাকে, আর একটি বৈঠকখানাও বটে, খাবার ঘরও বটে। বাসাটি ছোট কিন্তু এমন পরিচ্ছন্ন যে বসতে না বসতে মনে একটা শান্তির ভাব ছেয়ে গেল। পাশের পূজাঘর থেকে পবিত্র ধূপের গন্ধে মন কেমন যেন আরো উদাস হ'য়ে গেল।

"আমরা এ-কথা সে-কথা বলছি—এমন সময়ে দু পেয়ালা চা হাতে নিয়ে একটি মেয়ের প্রবেশ। শ্যামঠাকুর বললেন: 'আমার মেয়ে অন্নপূর্ণা। প্রণাম কর্ অনু—ইনিই সেই অসিতবাবু।'

"সুদর্শনা ষোড়শী প্রণাম ক'রে চোখ বড় বড় ক'রে বলল: 'অমলদার—'

'হ্যাঁ রে হ্যাঁ, ভিতরে নরম বৈরিগি বাইরে গরম বাবু—বড় সহজ মনিষ্যি নয়!' ব'লেই ফের হো হো ক'রে সে কী হাসি!'

* * *

অসিত কফির দ্বিতীয় পেয়ালা নিঃশেষ ক'রে ব'লে চলে:

"এই হ'ল শ্যামঠাকুরের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। সেবার কাশীতে দু-তিন দিনের নিমন্ত্রণে এসে দিন পনের কাটিয়ে গেলাম এঁরই টানে। কী চমৎকার যে কথা বলতেন তিনি! আর গুরু-

গম্ভীর কথাও ভাবকে গাঢ় রেখে হালকা সুরে বলবার সে কী অপূর্ব প্রতিভা! তার সঙ্গে নির্মল চরিত্র। আত্মাভিমান নেই অথচ জোর দিয়ে কথা বলতে পারে এমন সাধু তখনো পর্যন্ত চোখে পড়েনি। সত্যি, একটি আশ্চর্য মানুষ!

"আশ্চর্য মানুষ গরম বাবুদের সমাজেও কখনো কখনো চোখে পড়ে, কিন্তু নরম বৈরিগিদের মণ্ডলীতে এ-ধরণের উজ্জল জোরালো ব্যক্তিত্ব বড় বেশি চোখে পড়েনি আমার। ব্যক্তিত্ব বলতে এখানে আমি চরিত্র বৈশিষ্ট্যের কথা বলছি না। দুর্দান্তদের মধ্যেও তো এক ধরণের বৈশিষ্ট্য দেখা যায় অনেক সময়েই। আমি বলছি—তাঁর ভাববার ভঙ্গি, কথা কইবার ঢঙ—বিশেষ করে তর্ক সমাধানের বিশিষ্ট প্রবলতার কথা। পুঁথি পড়া জ্ঞান বৈদগ্ধ্য সংস্কৃতি, আর ভাগবত ভাবধারা থেকে সঞ্চিত আন্তর শক্তি—এ দুইয়ের চেহারা সম্পূর্ণ আলাদা। এমন কি মস্ত শিল্পপ্রতিভার শক্তিও ভাগবত চিত্তবলের সগোত্র নয়। ও আমাদের মুগ্ধ করে, কিন্তু এ দেয় ভরসা।"

বার্বারা বলল: "ঠিক বুঝলাম না কথাটা।"

অসিত বলল: "ব্যাখ্যা ক'রে বোঝানো একটু কঠিন। কিন্তু শ্যাম-ঠাকুরের ছবিটি আরো একটু স্পষ্ট ক'রে ফুটিয়ে তুললে হয়ত বুঝতে পারবে ভাগবত শক্তির কাছ থেকে সাধুরা যে খোরাক পান তার ফলে তাঁরা রাতারাতি কী রকম বলিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। তাঁর ঐ আকাশবৃত্তির ইতিহাস একটু বললে হয়ত একথাটা আপনা থেকেই সুবোধ্য হ'য়ে উঠবে।"

বার্বারা বলল: "আকাশবৃত্তি কথাটি মাঝে একদিন আমি দিদির কাছে শুনেছি নিরালায়। যাঁরা ভগবানের উপর একান্তভাবে নির্ভর করেন—তাঁদের বৃত্তির নাম, না?"

"না না। ভগবানের উপর নির্ভর তো অনেক সাধকই করেন। কিন্তু আকাশবৃত্তি যাঁরা অবলম্বন করেন তাঁদের নির্ভরের পথটি একটু বিচিত্র। আমাদের দেশে অনেক সাধুই আছেন যাঁরা ভিক্ষে করে দিন কাটান। কিন্তু শুধু ভিক্ষা ক'রে জীবিকা নির্ব্বাহ করলে তাকে আকাশবৃত্তি বলা যায় না। আকাশবৃত্তি হ'ল হাল ছেড়ে দিয়ে বসে থাকা—ভিক্ষা করব না, কেউ কিছু নিজে থেকে দিলে নেব নিরভিমানে—অথচ কারুর কাছেই কিছু চাইব না তো বটেই, ঘুণাক্ষরেও কোনো অভাবের কথা কাউকে জানাব না—এই ত্রিবিধ পণ নেওয়ার নামই আকাশবৃত্তি। আমাদের দেশে রামপ্রসাদ বলে এক মস্ত সাধক ছিলেন। তিনি তাঁর সাধনায় আকাশবৃত্তি অবলম্বন করেছিলেন কিনা কেউ নিশ্চিত করে বলতে পারে না, কিন্তু তাঁর একটি গানে এই বৃত্তির মনোভাবের একটি নিখুঁত ছবি আছে যে, আমার মনে হয় তাঁর সাধনায় একটি ষ্টেজে তিনি এই আকাশবৃত্তিকেই আঁকড়ে ধরেছিলেন। নৈলে তিনি এমন অপরূপ আকাশবৃত্তির প্রাণের কথাটি ফোটাতে পারতেন না :

'প্রসাদ বলে ভবার্ণবে বসে আছি ভাসিয়ে ভেলা,
জোয়ার এলে উজিয়ে যাব, ভাঁটিয়ে যাব ভাঁটার বেলা।'

কিন্তু ব্যাখ্যা রেখে তাঁর জীবনীর পাট বসাই তাহলেই বুঝবে কী বিচিত্র ছিল শ্যামঠাকুরের চলন বলন তথা অভয়বাণী।"

* * *

কফির শেষ পেয়ালাটি নিঃশেষ ক'রে অসিত খেই ধরল :

"এই দিন পনের ধরতে গেলে আমি তাঁর ওখানেই ছিলাম। কেবল রাতে শুতে যেতাম নিজের ঘরে—গঙ্গাতীরে একটি ঘর পেয়ে গিয়েছিলাম বিখ্যাত ধনী শিউপ্রসাদ গুপ্তের প্রাসাদে। তবে তিনি আমার দেখা খুব কমই পেতেন—আমি ত্রিসন্ধ্যা কাটাতাম শ্যামঠাকুরের বৈঠকখানায়,

আর মুগ্ধ হ'য়ে শুনতাম তাঁর কথা। খাঁটি বাংলা ভাষা ইংরাজি বুকনি না মিশিয়ে বলতে খুব কম শিক্ষিত বাঙালিই পারেন। কিন্তু যে-দুচারটি মানুষ পারেন—বা পারতেন বলাই ভালো—তাঁদের মধ্যে দুটি মানুষ আমার কাছে চিরদিনই নমস্য হয়ে থাকবেন—একজন রবীন্দ্রনাথ, আর একজন এই শ্যামঠাকুর। বাংলা ভাষার নিজস্ব মৌখিক ইডিয়ম আমরা শুধু গল্প ও নাটকেই লিখি আজকাল—মুখে এ-ইডিয়মের মান রাখি না বড় একটা। এমন কি আমাদের শিক্ষিতা ঘরণীরাও আজকাল কথাবার্তায় প্রায়ই ভর্তাদের বিলিতি বুকনি রপ্ত করতে আরম্ভ করেছেন। কিন্তু সে অন্য কথা।

"শ্যামঠাকুর যে একজন সত্যিকার রসাল কথক হয়ে উঠতে পেরেছিলেন তার একটি কারণ তিনি কোনোদিনই শহুরে মানুষ ছিলেন না। ইংরাজি অল্প স্বল্প জানতেন—কলকাতায় আই, এ পর্যন্ত পড়েছিলেন, কিন্তু কলকাতা তাঁর ধাতে সইল না, আই, এ পাশ দেবার আগেই ফিরে এলেন নিজের গ্রামে—বলতেন হেসে প্রায়ই: বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য আর পাদমেকং ন গচ্ছামি, বাবা! বাপ্, শহরে কি মানুষ থাকে? প্রতি মোড়ে গাড়ি চাপা পড়ার ভয়—তার উপর উঃ—রেডিয়ো কর্ণশূল। শহর আমার মাথায় থাক—আর ভিটে ছাড়া হওয়া নয়।' হায়রে, তখন যদি জানতেন—কিন্তু না, যথা পর্যায়েই বলি।

"পাড়াগেঁয়ে মানুষটি বৌও পেয়ে গেলেন নিজের গ্রামেই। তারপর তাঁর দেখতে দেখতে ওখানে যাত্রাগান রামপ্রসাদী গেয়ে একটু নামও হ'ল—এমনি সময়ে গ্রামের জমিদারের সুনজরে পড়ে গেলেন। সুদর্শন সরল সুকণ্ঠ ছেলেটির 'পরে তাঁর মায়া পড়ে গেল—দিলেন তাকে সেরেস্তায় এক কাজ। এর পরে এ-গ্রাম্য দম্পতীর জীবন বেশ সুখেই কাটছিল—কারণ স্ত্রী কমলাদেবীও ছিলেন শুধু পতিব্রতা গৃহলক্ষ্মীই নয়,

স্বামীর মতনই সরল, আর একটিমাত্র মেয়ে অন্নপূর্ণা যেমন হাসিখুসি তেমনি সুন্দরী—এমন সময়ে বিধাতা পুরুষ সাধলেন বাদ—গ্রামে এলেন এক সাধু—আনন্দগিরি। উজ্জলকান্তি শাদাচুল পাকাদাড়ি আনন্দগিরি গ্রামে আসতে না আসতে হৈ চৈ পড়ে গেল। শ্যামঠাকুর ও কমলা-দেবী তো উচ্ছ্বসিত! রোজই তাঁর পাঠ শুনতে যেতে আরম্ভ করলেন সন্ধ্যার পরে।

"আনন্দগিরি ছিলেন একটু আশ্চর্য ধরণের সাধু, স্বাতন্ত্র্যপন্থী। তাই শঙ্করাচার্যের দশনামী সম্প্রদায়ে নাম লিখিয়েও তিনি হয়ে উঠেছিলেন অনামী। কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলতেন—'আমি কেউ না বাবা, কোনো পথেই চলি না আবার সব পথেই চলি, কারণ দেখি ঠাকুর আমার সব পথেই চলেছেন সমানে।' জ্ঞানের কথা বলতেন বেশির ভাগ উপমা দিয়ে কিন্তু সংক্ষেপে—কেউ বেশি প্রশ্ন করলে বলতেন: 'যারা সাধনা না করে সব কিছু জেনে মেরে দিতে চায় তাদের বুদ্ধি যায় ভেস্তে—কারণ তারা সব কিছুই উল্টো বোঝে।' কিন্তু তাঁর চোখে বয়ে যেত ধারা যখন তিনি পাঠ বা ভজন করতেন। তাঁর মুখে মীরা ভজন ও মহাভারত, রামায়ণের ব্যাখ্যা শুনে শ্যামঠাকুর মুগ্ধ হন। আনন্দগিরি সুর করে গাইতেন তুলসীদাসী দোঁহা:

'নাম জীহ জপি জাগাহিঁ জোগী।
বিরতি বিরঞ্চি প্রপঞ্চ বিয়োগী॥
ব্রহ্মসুখহি অনুভবহিঁ অনুপা।
অকথ অনাময় নাম ন রূপা॥'

অর্থাৎ সংসারের মোহঘুম ছেড়ে যে যোগী একবার নাম জপে জেগে ওঠেন তিনি যে অনুপম ব্রহ্মসুখ পান সে-সুখ যে কী অনাময় তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না—কেন না সে-সুখের না আছে নাম, না রূপ। তাঁর

কাছে এই ধরণের সব পদাবলী শ্লোক দোঁহা প্রভৃতি শুনতে শুনতে শ্যামঠাকুরের মনে জেগে উঠল রামভক্তি। তিনি সস্ত্রীক আনন্দগিরির কাছে দীক্ষা নিলেন—রামমন্ত্রে।

"কী কাণ্ড! এ-মন্ত্র তাঁর জীবনে সক্রিয় হ'ল খানিকটা তোমাদের টাইম-বোমার ঢঙেই। মাসখানেক জপ করতে না করতে ফাটল বোমা, ঘটল অঘটন: দুর্লভ অবস্থা—'নয়নং গলদশ্রুধারয়া বচনং গদ্‌গদরুদ্ধয়া গিরা' যাকে বলে—চোখের জলে ভুবন ঝাপসা, কথার আবেগে রুদ্ধ কণ্ঠ। আনন্দগিরি মস্ত সাধু হওয়া সত্ত্বেও অবাক্। বললেন শিষ্যকে: 'তোমার স্বধর্ম চাকরি নয়—আকাশবৃত্তি। তুমি গীতা ভাগবত রামায়ণ পাঠ করো আর শোনাও হরিনাম আশপাশের লোককে। চাকরি ছেড়ে দাও।' শ্যামঠাকুর তো আকাশ থেকে পড়লেন, বললেন: 'গুরুদেব! আমি তো পণ্ডিত নই আপনার মতন—তাছাড়া আমি হরিনাম শোনাব কি বলুন? আমি যে অনধিকারী!' আনন্দগিরি ধম্‌কে বললেন: 'রামনামে যার চোখে জল আসে মাসখানিকের জপেই সে অনধিকারী, আর অধিকারী হ'ল কিনা পুঁথিপড়া পণ্ডিত! শোনো—তুমি যে শুধু মহা ভাগ্যবান তাই নয়—তোমাকে শিষ্য পাওয়া আমার মহাভাগ্য। তবু এখনো কিছুদিন তোমাকে চলতে হবে আমার কথা শুনে—বেশিদিন নয়, দু তিন বৎসর মাত্র, তারপর ঠাকুরের নির্দেশ তোমার হৃদয়ে আপনা আপনিই জেগে উঠবে, গুরুর মাধ্যমের দরকার হবে না। তবে এখন আমার স্বস্থানে ফিরবার সময় হ'ল ব'লে একটা কথা প্রকাশ করি: ঠাকুর আমাকে আদেশ দিয়েছিলেন বাংলা দেশে কিছুদিনের জন্য ফিরতে—আর সে কেবল তোমার জন্যেই। তাই শুধু এইটুকু বলা যে, তুমি মনে রেখো: তোমার স্বধর্ম—আকাশবৃত্তি, আর স্বকর্ম—তাঁর নামগান। আকাশবৃত্তি তোমাকে নিতে হবে কেন আমি বলতে পারব

না—কারণ সবাইকে এ-বৃত্তি নিতে হয় না। তবে এটুকু বলতে পারি যে, যে নিতে পারে সে ভাগ্যবান অধিকারী, কেম না তার ভার তখন ঠাকুর নিজে নেন। কী ভাবে—তুমি বুঝবে পরে। এখন তুমি শুধু এইটুকু জেনে রাখো যে, তিনি যাকে একবার চেপে ধরেন তাকে—ভাগবতের ভাষায়—একেবারে নিঃস্ব না করে ছাড়েন না : যস্যাহম্ অনুগৃহ্ণামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ—বলেছেন তিনি ভাগবতে। অতএব নির্ভয়ে হও নিরবলম্ব, তোমার জমিদার ভর্তাকে গিয়ে সোজা বলো—তুমি এখন থেকে শুধু রামের চাকর, আর কারুর নও।'

"কমলাদেবীর মাথায় তো আকাশ ভেঙে পড়ল! তিনি সরাসর গিয়ে মাথা কুটলেন আনন্দগিরির পায়ে : 'এ কী নিদারুণ ব্যবস্থা ঠাকুর! আমরা যে সংসারী—উনি আকাশবৃত্তি নিলে মেয়ের বিয়ে দেবে কে—সংসার চালাবে কে?' আনন্দগিরি হেসে বললেন : 'মা, যুগ যুগ ধ'রে যিনি ব্রহ্মাণ্ড চালিয়ে এসেছেন তিনি একটি ছোট্ট পাড়াগেঁয়ে পরিবারের সংসারটি চালাতে পারবেন না মনে করো? তোমাকে সেদিন বলি নি কি গীতার কথা যে, অনন্যমনে যে তার উপাসনা করে ঠাকুর কথা দিয়েছেন তাকে রাখেনই রাখেন—ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি?"

অসিত একটু থেমে মৃদু হেসে বলে : "এই হ'ল সুরু শ্যামঠাকুরের ঘরোয়া জীবনে বেপরোয়ার আদিপর্ব। ভাব জাগতে না জাগতে সব ছত্রাকার—উলটপালট—খানিকটা যেমন কালো ঝড় উঠলে হয়—দুদণ্ড আগে যেখানে ছিল গাছপালা কুটীর, দুদণ্ড পরে—একেবারে নিশ্চিহ্ন। শ্যামঠাকুরের একটি কথা আজো মনে পড়ে—কেন না আমার জীবনেও বারবারই ঘটেছে এ অঘটন। বলতেন তিনি : 'এরি নাম ঠাকুরের লীলা রে ভাই! কাকে যে তিনি কোন্ পাকে ফেলে কোন্ তীরে টেনে তোলেন, কেউ কি জানে?"

*   *   *

কফিতে চুমুক দিয়ে অসিত ফের শুরু করল: "গ্রামে কোলপাড়। সরল সদাশয় সুকণ্ঠ শ্যামঠাকুরকে অনেকেই স্নেহ করতেন—তিনিও মাঝে মাঝে এখানে ওখানে রামপ্রসাদী গান গেয়ে অনেককেই মুগ্ধ করেছিলেন, তার উপর তাঁর গৃহলক্ষ্মী কমলাদেবীও সতিাই লক্ষ্মী যাকে বলে—প্রতিবেশীরা তো মহা খাপ্পা, গিয়ে ধরল জমিদারকে 'ঐ সর্ব্বনেশে সাধুই যত নষ্টের গোড়া, ওকে দিন তাড়িয়ে। শ্যামঠাকুর ভালো মানুষ, ওর কথা শুনে এবার দ-য়ে মজবে সপরিবারে।' জমিদার শ্যামঠাকুরকে হারাতে রাজি না হলেও শিউরে উঠে বললেন: 'সাধুকে তাড়াব এত বড় বুকের পাটা আমার নেই। তবে শ্যামলালকে বুঝিয়ে সুজিয়ে বলতে পারি।'

"কিন্তু যে একবার নামরসের স্বাদ পেয়েছে তাকে বোঝাব কোন্ মহানামী? অথঃ শ্যামঠাকুর গৃহধর্ম ছেড়ে বনলেন কথক—এখানে ওখানে গাছতলায় বসেই সুরু করে দিলেন—করলেন নাম গান, গীতা ভাগবত চরিতামৃত পাঠ।

"প্রথম দিকে দিন চলা ভার হয়ে উঠল বৈকি। কিন্তু দেখতে দেখতে কেমন যেন সব বিরোধ হয়ে গেল ঠাণ্ডা। বিশেষ করে যখন তিনি চরিতামৃত পাঠ ক'রে নিরক্ষর প্রতিবেশী প্রতিবেশিনীদের বুঝিয়ে দিতেন—তখন চোখের জলের সঙ্গতে তাঁর কণ্ঠে বেজে উঠত এক অপরূপ ভাবের সুর। কারুর কাছে কিছুই তিনি চাইতেন না, কিন্তু প্যালা পড়ত তাঁর পাঠে—এক আনা দু আনা সিকি আধুলি। মাসের শেষে দেখেন—অবাক কাণ্ড। চাকরিতে যা মাইনে পেতেন ঠিক ততগুলি টাকা জুটে যাচ্ছে। সংসার আগের মতই চলল—যদিও সময়ে সময়ে এমনও হ'ত যে ঘরে চাল বাড়ন্ত। কমলাদেবী কেঁদে সারা, কী খেতে দেবেন স্বামীকে, মেয়েকে? কিন্তু কোত্থেকে কে যে পাঠিয়ে দিত সিধে—

অনাহারে তাঁদের একদিনও কাটে নি যদিও উদ্বেগে কেটেছে অনেক-দিনই—বিশেষ করে মা ও মেয়ের।

"তবু এমনই মানুষের মন মেনেও মানতে পারে না। তাই শ্যাম-ঠাকুর যে শ্যামঠাকুর তাঁরও মনে থেকে থেকে উঠত দুশ্চিন্তা 'যদি পাঠ না জমে, যদি অসুখ করে? খাব কী?' তার পরেই ঘটত একটা না একটা অঘটন, পাঠ না জমলেও জুটত প্যালা, অসুখ করলেও আসত অপ্রত্যাশিত প্রণামী। তখন অনুতপ্ত হয়ে গৃহদেবতার পায়ে লুটিয়ে পড়তেন 'কবে নির্ভর আসবে ঠাকুর?' সঙ্গে সঙ্গে মনের আঁধার যেত কেটে, বলতেন স্ত্রীকে: 'ঠাকুর যখন হালে—খেয়াপারে ঠেকায় কে?'

"কিন্তু এবার এল একটা মস্ত পরীক্ষা। অন্নপূর্ণা চোদ্দ পার হয়ে পড়ল পনেরয়। সবাই সুর ধরল সমতালে: 'অরক্ষণীয়া—বিয়ে দাও বিয়ে দাও।' কিন্তু অন্নপূর্ণা সুন্দরী হলেও বৃত্তিহীন গরিবের মেয়ে নিতে কেউই এগোয় না। শ্যামঠাকুর প্রথমটায় অচঞ্চল ছিলেন কিন্তু চারদিকের কলরবে ক্রমে একটু একটু করে ফের জাগল সেই দুশ্চিন্তা—তাই তো! কূলকিনারা না পেয়ে লিখলেন গুরুদেবকে চিঠি: 'কী হবে গুরুদেব?' উত্তর এল শুধু দুটী কথা: 'মেয়ে কার! তোমার, না তাঁর?'

"কিন্তু গ্রামের লোক ছাড়ে না, বিশেষ করে গিন্নিবান্নির দল। নানা ছলে প্রায়ই এসে বলে কমলাদেবীকে: 'চেষ্টা চরিত্তির না করলে কি আজকালকার দিনে মেয়ের বিয়ে হয়? তোমার কর্তাকে বলো কলকাতায় যেতে একবার—এমন সুন্দর মেয়ে'...ইত্যাদি। শ্যামঠাকুর ফের গুরুদেবকে লিখলেন। উত্তর এল: 'কলকাতা কেন? কর্তা কে? তুমি না তিনি?'

কিন্তু ক্রমে এমন হল যে অন্নপূর্ণা ঘরের বাইরে উঁকি দিতেও ভয়

পায়। মেয়েরা সবাই বলাবলি করে: 'আইবুড় মেয়ে এত বড়টি গা? কী যে হবে ওর দশা' মাগো মা!' আরো কত কথা কেচ্ছা। মনের দুঃখে একদিন কমলাদেবী এক পড়োশিনীর কাছে বলে ফেললেন মুখ ফসকে: 'ঠাকুরের এ কী ব্যবস্থা বোঝা দায়। ভিকিরিই যদি করবেন তবে ছেলে না দিয়ে মেয়ে কেন?' অন্নপূর্ণা ছিল পাশের ঘরে। মাঝে মাঝেই সে কাঁদত লুকিয়ে লুকিয়ে। এবার আর পারল না। স্থির করল বাপ মার ভার হয়ে আর থাকবে না। গলায় কলসী বেঁধে ভোরবেলা পুকুরে ডুবে আত্মহত্যা করতে যাবে—এমন সময়ে পিছন থেকে ওকে জড়িয়ে ধরল যমুনা—ওর বাল্য সখী। কান্নাকাটি শুনে পাশের ঘর থেকে ওর দাদা বেরিয়ে এল—বাইশ বছরের সুদর্শন যুবক অনিল। মেধাবী ছাত্র, কলকাতায় এম, এ-তে ফার্ষ্ট হয়ে রিসার্চ করছে। সবে পুজোর ছুটিতে দেশে ফিরেছে। বাপ কলকাতার এক মস্ত সওদাগরি অফিসের বড়বাবু—থাকেন গরম চালে। তাঁর ইচ্ছা ছিল খুব বড় ঘরে সোনার চাঁদ ছেলের বিয়ে দেবেন। কিন্তু বিধাতা পুরুষ মুচকে হাসলেন অলক্ষ্যে। অনিল অন্নপূর্ণার অনিন্দ্য কান্তি দেখে একেবারে অথই জলে। এমন মেয়ে কিনা জলে ডুবে মরতে যায়। ধিক্! তাছাড়া পণপ্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলনে তার বলিষ্ঠ মত দিয়েছিল সাড়া। সবার উপরে যৌবনের জোয়ার পরিনাম চিন্তা গেল ভেসে। যমুনাকে বলল: 'সে অন্নপূর্ণাকেই বিয়ে করবে।' মা রাজি, কিন্তু বাবা একেবারে অগ্নিশর্মা। ভিখিরির মেয়েকে ঘরে আনবেন? ধিক। মা শুনে কেঁদে সারা। সাধুকে ভিখিরি বলা? অকল্যাণ হবে যে। গ্রামে ফের নানা কথার সৃষ্টি! যমুনা বড় ভালবাসত অন্নপূর্ণাকে, সেও ধরল: 'আহা! অমন সুন্দর বৌ বাবা রাজার ঘরেও পাবেন নাকি? তাছাড়া এমন ফুলের মত নির্মল মেয়ে।' ঘরে বিষম অশান্তি। অনিলও বেঁকে

বসল। বলল: 'ওকে ছাড়া আর কাউকেই বিয়ে করবে না।' দেখতে দেখতে গ্রামেও অনেকেই অনিলের দিকে দাঁড়ালেন। অগত্যা শেষটায় বাপকেও সায় দিতে হ'ল। অপিসের বড়বাবু হলেও একা কতদিন যুঝবেন ? বিয়ে হয়ে গেল। ঠিক বিয়ের দিন আনন্দগিরির পুনরভ্যুদয়। বললেন হেসে: 'কী রে শ্যামলাল? এ-বিয়ের কর্মকর্তা বলবি কাকে?' শ্যামঠাকুর গুরুদেবের পায়ে লুটিয়ে পড়লেন: 'গুরুদেব! কত পাই তবু ভুলে যাই কেন?'

"অন্নপূর্ণা বিয়ের পরে খুসী হল বৈকি। কেবল অনিলের বাপ মাঝে মাঝে কলকাতা থেকে ফিরলে তাকে একটু ভয়ে ভয়ে থাকতে হত প্রথম দিকে। কিন্তু ক্রমশ শ্বশুরও পুত্রবধূর লক্ষ্মীশ্রীতে, সেবায় ও স্বভাবগুণে মুগ্ধ হলেন। বললেন: 'অপরাধ করেছি মা—মনে রেখো না।' অন্নপূর্ণা পায়ের ধুলো নিয়ে বলল: 'অমন কথা বলবেন না বাবা। কেবল আশীর্বাদ করুন যেন ঠাকুরের কৃপার যোগ্য হই। আবাল্য ধামিক বাপের সংস্পর্শেই ওর মনটি ফুলের মতনই শুভ্র হয়ে ফুটে উঠেছিল।

"এবার এল আর এক পরীক্ষা। আনন্দগিরি শিষ্যকে বললেন: 'এ গ্রামে তোমার কাজ শেষ হয়েছে। তুমি কাশী যাও। সেখানে বসাও নামগানের পাঠ।' শ্যামঠাকুরের মুখ শুকিয়ে গেল, বললেন: 'গুরুদেব, এখানে আমার তবু যাহোক একটা নাম ডাক হয়েছে, কাশীতে আমাকে জানে কে? চলবে কী করে।' আনন্দগিরি হেসে বললেন: 'এখানে যিনি সচল সেখানে কি তিনি অচল, না ঠুঁটো।'

ঘরে ফের কান্নাকাটি। এ কী বিড়ম্বনা। গ্রামের লোক এবার ক্ষেপে উঠল। 'সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়। শ্যামঠাকুর এখানে তবু একটা ঠাঁই করে নিয়েছেন কাশীতে বেঘোরে পড়ে কী হবে বেচারির। এবার

অন্নপূর্ণা গিয়ে পড়ল আনন্দগিরির পায়ে: 'বাবাকে কেন দেশান্তরে পাঠাচ্ছেন গুরুদেব! সেখানে তাকে দেখবে কে?' গুরুদেব বললেন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ আবছা হেসে: 'কে কাকে দেখে মা? দেখেন শুধু একজনই সেই দীন দয়াল, আর আমরা সবই দেখি—কেবল তাঁকে ছাড়া।' অন্নপূর্ণা আঁচলে চোখ মুছে বললেন: 'ক্ষমা করবেন গুরুদেব। বুঝেছি এবার।'

* * *

অসিত একটু থেমে ফের শুরু করল।

"শ্যামঠাকুর কাশীতে এলেন একেবারে একা। তাঁকে না বলে তাঁর বেচাই কাশীতে লিখে দিলেন এক চিঠি তাঁর এক ভাইপোকে, যেন শ্যামঠাকুরের একটু দেখা শুনা করে। এ ছেলেটির নাম সুধেন্দু।

"কোথেকে যে কী হয়? শ্যামঠাকুর প্রায়ই বলতেন আমাকে একটি কথা: 'ভাই মিথোই আমরা ভেবে মরি—যা করার করেন তিনিই, আমরা শুধু হাঁকুপাঁকু ক'রে কষ্ট পাই—এই দেখ না সুধেন্দু—কোথেকে ও এল বলো তো? আর কেনই বা আমাদের জন্যে এত করল! সে কী সোজা করা ভাই—আমাদের জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ—সব ব্যবস্থাই সে ক'রে দিল—না চাইতে। অথচ আমরা কতই না ভাবতাম—কী হবে কাশীতে—যেখানে আত্মীয়-স্বজন তো দূরে থাকুক একটি চেনা মুখ পর্যন্ত যে নেই!'

অসিত একটু থেমে ব'লে চলল: "সুধেন্দু সত্যি ওঁদের কী যে সেবাটা করত দিনের পর দিন! শুধু ফাইফরমাস খাটা নয়—কাশীর নানা বর্ধিষ্ণু পরিবারেই সে শ্যামঠাকুরের নামগুণগান ক'রে দিতে নানান্ উপলক্ষে তাঁর নিমন্ত্রণ জুটিয়ে। তার একটা মস্ত সুবিধে হ'য়ে গিয়েছিল সে ছিল মস্ত পালোয়ান ব'লে। নানা প্রদর্শনীতে দেহবলের এ ও তা

নানান্ প্রতিযোগিতায় সে প্রায়ই হ'ত ফার্স্ট—সর্বত্রই তার আদর—পপুলার যাকে বলে। কাজেই যুবক হ'য়েও সে হ'য়ে দাঁড়াল প্রবীণের পৃষ্ঠপোষক। ফলে প্রবীণের জুটে যেত প্যালা—খুব বেশি না হোক—চ'লে যেত টায় টায়।

"কিন্তু সংসার অচল না হওয়া সত্ত্বেও কমলাদেবী কাশীতে প্রথম দিকে প্রায়ই মন-মরা হ'য়ে থাকতেন। গ্রামে ছিলেন তিনি স্বামীর ভিটেয়—চারদিক খোলা, আলো হাওয়া, গাছে গাছে ভোর থেকে পাখী ডাকে—তাছাড়া নিজের একটু ক্ষেত-খামারও ছিল। কিন্তু কাশীর ভাড়াবাড়ির ঘুপচিতে এসে তিনি স্বস্তি পেতেন না, বিশেষ ক'রে মন কেমন করত অন্নপূর্ণার জন্যে। একদিন তিনি নিজেই গুরুদেবকে লিখলেন। উত্তর এল—'মেয়ে আসতে চায় তো আসুক না কিছুদিনের জন্যে।' শ্যামঠাকুর মাথা চুলকে বললেন: 'কিন্তু এ-ঘুপচিতে—তাছাড়া—যা পাই তাতে দুজনের টায়ে টায়ে চ'লে যায়, মেয়ে এলে—'। কমলাদেবী নাছোড়বন্দ্। কী করেন ?—বিপদে প'ড়ে শ্যামঠাকুর লিখলেন গুরুদেবকে: 'আকাশবৃত্তি তো নিয়েছি আমি একাই গুরুদেব, কমলাকে কেন মিথ্যে কষ্ট দেওয়া—ওকে ফেরত পাঠিয়ে দিই গ্রামে।' গুরুদেব লিখলেন: 'একলা মানুষের চ'লে যায়ই একরকম ক'রে। নির্ভরদীক্ষারও ক্রম আছে—তাই তোমাদের দুজনকে কাশী পাঠানো—তিনজন হ'লে আরো ভালো হ'ত।' শ্যামঠাকুর ভাবনায় প'ড়ে গেলেন, লিখলেন: 'অন্নপূর্ণাকে হয়ত তাঁরা পাঠাতে পারেন—কিন্তু যদি দিন না চলে ?' গুরুদেবের জবাব এল পিঠ পিঠ: 'তাহ'লে ঠাকুরের নামে আর একটা কলঙ্ক বাড়বে বৈ তো নয়—বোঝার উপর শাকের আঁটি সইবে।' কমলাদেবী ভৎ'সনা করলে স্বামীকে: 'কী লেখো সব যা তা গুরুদেবকে ?' শ্যামঠাকুর অনুতপ্ত হ'য়ে লিখলেন: 'সে কী কথা

গুরুদেব! ঠাকুরের কলঙ্ক? তাঁর কৃপা যে কত—বারবারই দেখিনি কি? কিন্তু হাতে যে একেবারে টাকা নেই—মেয়েকে আনাই কী ক'রে?' এ-চিঠির উত্তরে এল: 'আমি কি বলেছিলাম মেয়ে আনতে? বলেছিলাম সে আসতে চায় তো আসুক না! দিনদুনিয়ায় কে কাকে আনায় বা পাঠায় শ্যামলাল—শুধু একজন ছাড়া?' শ্যামঠাকুর এ-চিঠির মানে বুঝলেও ঠিক অর্থপরিগ্রহ করতে পারলেন না—গুরুদেবের মৎলবটা কী? কেবল ভাবেন আর ভাবেন!

"হবি তো হ—এই সময়ে কমলাদেবীকে তাঁর বেহান চিঠি লিখলেন যে অন্নপূর্ণা গর্ভবতী—যদি মেয়েকে নিয়ে যেতে চান তবে বেলা থাকতে থাকতে নিয়ে যাওয়াই ভালো। শ্যামঠাকুর তো মাথায় হাত দিয়ে পড়লেন: হাতে পুঁজি মাত্র পাঁচটি টাকা! ঘুম হ'ল না সারারাত।

"পরদিন সকালে মণিঅর্ডারে দু'শো টাকা এসে হাজির। শ্যাম-ঠাকুরের গ্রামের এক ভক্ত লিখল: 'মা আপনার কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন নিশ্চয়ই আপনার মনে আছে। তিনি সম্প্রতি বুকের ব্যথায় শয্যাশায়ী। আমাকে বললেন কেঁদে যে তিনি আপনার কাশীবাসের বিরোধী ছিলেন, সেই পাপেই তাঁর এ দশা। তিনি আপনাকে দু'শো টাকা প্রণামী পাঠাচ্ছেন আপনার জন্মদিন উপলক্ষ্যে। আশীর্বাদ করবেন মা যেন সেরে ওঠেন।'

"শ্যামঠাকুর অনুতপ্তা শিষ্যাকে আশীর্বাদ পাঠিয়ে দিলেন। দিন দশেক বাদে চিঠি এল: 'মা আপনার আশীর্বাদে সম্পূর্ণ সেরে উঠেছেন—একেবারে যাকে বলে মিরাকুলাস কিওর। আমাদের কৃতজ্ঞতা ও প্রণাম। যদি কিছু দরকার থাকে জানাবেন।' শ্যামঠাকুর ফের আশীর্বাদ পাঠিয়ে লিখলেন: 'না, ঠাকুর রয়েছেন—দরকার আবার কী?'

"দু-চারদিন বাদে হঠাৎ এই বর্ষীয়সী শিষ্যাটি লিখলেন: 'ঠাকুর আপনার জন্মদিনে চরণ দর্শনে যাওয়ার সাধ—অন্নপূর্ণাও ধরেছে—আপনার বেয়ান আমার সঙ্গে তাকে পাঠাতে রাজি—যদি আপনি অনুমতি দেন।' শ্যামঠাকুরের চোখ উঠল ছলছল ক'রে। লিখলেন গুরুদেবকে: 'না গুরুদেব, ঠাকুরের কলঙ্কের বোঝা বাড়তে পেল না—এযাত্রাও তিনি রাখতেই চাইলেন, মারতে না। কিন্তু বলুন তো কী যোগাযোগ!' গুরুদেব লিখলেন: 'এ ঠাকুরের ইচ্ছায়ই ঘটেছে—কারণ তুমি অন্নপূর্ণাকে নিজে যেচে গিয়ে আনতে চাও নি—ঠাকুরের উপরেই ছেড়ে দিয়েছিলে।'

"এই শিষ্যাটির অবস্থা ছিল ভালো। দুদিন বাদে ওদের ঘরের মোটরেই মা ও ছেলে এসে হাজির অন্নপূর্ণাকে নিয়ে শ্যামঠাকুরের জন্মোৎসবের কয়েকদিন আগে।

কিন্তু যে যত ওঠে তার পরীক্ষাও হয় তেমনি কঠিন। ঘটল ফের এক দুর্দৈব। কাশীতে এসেই অন্নপূর্ণা ধরল গঙ্গাস্নান করতে যাবে। আসন্নপ্রসবা মেয়েকে গঙ্গাস্নানে পাঠাতে শ্যামঠাকুরের মন চাইল না। কিন্তু অন্নপূর্ণা ধ'রে পড়ল: 'গঙ্গাস্নানে কখনো অমঙ্গল হ'তে পারে?' শ্যামঠাকুর লজ্জিত হ'য়ে বললেন: 'খুব শিক্ষা দিলি মা! কিন্তু দাঁড়া তাহ'লে আগে ওদের মোটরটা চেয়ে পাঠাই।' অন্নপূর্ণা বলল: 'গঙ্গা তো কাছেই বাবা।' শ্যামঠাকুর বললেন: 'না না, পথে বড় ভিড়—যদি ধাক্কাধাক্কি লাগে, কাজ কি?' শিষ্যাকে ব'লে পাঠাতেই সে তৎক্ষণাৎ মোটর পাঠিয়ে দিল। এই প্রথম তিনি কারুর কাছে কিছু চাইলেন নিজে থেকে। না চাইলেই ভালো ছিল। হ'ল কি, পথে মোটরের ধাক্কা লাগল এক একার সঙ্গে। অন্নপূর্ণার তলপেটে লাগল চোট। গঙ্গাস্নানে যাওয়া হ'ল না। ফিরে এসেই কেবল বমি।

ডাক্তারের মুখ গম্ভীর। শ্যামঠাকুর গুরুদেবকে লিখলেন সব কথা। গুরুদেব লিখলেন: 'মোটর চাইলে কেন? অপ্রতিগ্রহ ব্রত ভঙ্গ করলে কর্মফল কিছু অন্তত ভুগতেই হবে। তবে ভবিষ্যতে আর যেন এরকম না হয়' আর এক কথা: এখনো এত উদ্বেগ কেন? যে এখনো আমার আমার করে সে পরম নির্ভরের পরীক্ষায় পাশ হবে কেমন ক'রে?'

"ডাক্তারের চিকিৎসায় দিন পনের বাদে, মেয়ে খানিকটা সেরে উঠল বটে কিন্তু তাঁর দুশোর একটি টাকাও রইল না। তার উপর এ-পনের দিনের পর তাঁর নিজের হ'ল নিউমোনিয়া। মাসখানেক বাদে সেরে উঠলেন বটে কিন্তু তখন এমন অবস্থা যে দিন চলা হ'য়ে উঠল ভার। এ রকম বিপন্ন তিনি কখনো হন নি। এদিকে আসন্নপ্রসবা মেয়ে, ওদিকে ডাক্তারের আদেশ—মাসখানেক পুরো বিশ্রাম না নিলে তাঁকে ফের শয্যাশায়ী হ'তে হবে। সুখেন্দুও ভেবে সারা—ঠাকুর পাঠ না করলে প্যালা পাবেনই বা কেমন ক'রে? সে এখান ওখান থেকে কিছু কিছু আনিয়ে প্রণামী দিত তাতে কোনমতে সংসার খরচটা সামলানো যেত বটে, কিন্তু বাড়িভাড়ার কা হবে? সংসারী মানুষ ধার করতে পারে, কিন্তু এ যে বিচিত্র অবস্থা—না গৃহী না সন্ন্যাসী—কাউকে মুখ ফুটে অভাবের কথা জানারও যে উপায় নেই! এদিকে বাড়িওয়ালার ত তাগাদার অন্ত নেই। তারা দু ভাই—দারুণ বেনে। মাস পয়লাই হাজির হবে ভাড়া আদায় করে নিতে। কিন্তু এখন দেখতে দেখতে দেড়মাস ভাড়া বাকি! ওরা কর্কশকণ্ঠে ব'লে গেল একদিন সকালে এসেই—'সাধু ফাধু বুঝি না মশাই শেষ কথা আর পনের দিনের মধ্যে দুমাসের ভাড়া চুকিয়ে দিতে পারেন ভালো, নৈলে বাড়ি দিতে হবে ছেড়ে—যাকে বলে 'আল্টিমেটাম'।

"মেয়ে অসুস্থ তার উপর ন'মাস গর্ভবতী—ট্রেনে ক'রেও এখন আর গ্রামে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় না। উপায় ? শ্যামলাল গুরুদেবকে লিখলেন। উত্তর এল : 'ফের পথ খোঁজা—দিশা না জেনে ? ঠাকুরের উপর সব ছেড়ে দিয়েছে যে তার কি ভাবনা সাজে ?'

অসিত থেমে বার্বারার দিকে চেয়ে বলল : "তারপর যা ঘটল সে এমনি আশ্চর্য যে বলতে ভয় পাচ্ছি পাছে ভাবো আজগুবি। কিন্তু সুরু যখন করেছি তখন সারা করাই চাই। তাই শোনো।"

"আমি ঠিক এই সময়েই কাশীতে দিনের পর দিন শ্যামঠাকুরের ওখানে কাটাচ্ছি। তিনিও দিনের পর দিন কেবলই ঠাকুরের কথাই ব'লে চলেছেন—নিজের ভাবনা চিন্তার কথা আমাকে ঘুণাক্ষরেও জানান নি—অভাবের কথা তো নয়ই। পরমানন্দেই দিন কাটাচ্ছি আমি এই সদানন্দ মুক্তপুরুষটির সঙ্গে। এমন সময়ে হঠাৎ আমার এক সাবেক কালের বন্ধু এলাহাবাদ থেকে এসে হাজির—আমি কাশীতে, শুনে। নাছোড়বন্দ্—এলাহাবাদ যেতেই হবে—তাঁর বন্ধু-বান্ধব বিষম ধরেছে। ইচ্ছা অনিচ্ছার দোটানায় প'ড়ে গেলাম তাঁর সঙ্গে। কিন্তু এলাহাবাদে দু' তিন দিন নানা ফ্যাশনেবল আসরে গান গাইতে গাইতে মনে গ্লানি এল ছেয়ে। এ কোথায় এলাম—যেখানে কেবল পার্টি আর পার্টি—ফুলের মালা আর সুবসনা শিক্ষিতাদের ভিড় ! শুধু কি তাই ? বাধ্য হ'য়ে বন্ধু-বান্ধবীর সঙ্গে কথা কইতে হত সায়েন্সের, শিল্পের, সিনেমার, বিলেতের নানা মনীষীর ভাবধারার—সে কি সোজা কালচার্ড কথালাপ ! কিন্তু কী করি ? দশচক্রে প'ড়ে ফের সেই দারুণ আবর্তেই পড়ে গেলাম যা থেকে অতিকষ্টে উঠেছিলাম সৎসঙ্গের শ্যামল কূলে। কেবলই মনে হয় শ্যামঠাকুরের একটা কথা : 'ভাই রে, অনিত্য বড় সহজ পুরুষ নন—নিত্যের ছদ্মবেশ ধ'রে যখন আসেন তখন

সাধ্য কি তাঁর নিজমূর্তি আন্দাজ করবে? সাধে কি ঠাকুর বলেছেন গীতায় যে তাঁর গুণময়ী মায়াকে মায়া ব'লে চিনতে পারে কেবল সে যে চিনেছে মায়েশকে?' সত্যিই দেখলাম তাই। সব বুঝেও তবু কোথায় যেন একটু ভালো লাগে—অহমিকা গোঁফে চাড়া দেয় ফুলের মালা পেয়ে। নৈলে কি আর কেউ ড্রয়িং রুমে ড্রয়িং রুমে ফিরি ক'রে বেড়ায় বৈরাগ্যের বেহাগ ভক্তির ভূপালী? কিন্তু এই সূত্রে যেন আরো বুঝতে পারলাম—শিখলাম বলাই ভালো—যে বৈরাগ্যের ভাব ভক্তির আবেশ সাধুসঙ্গের অপেক্ষা রাখে—অনুকূল আবহে সে উজিয়ে ওঠে বটে, কিন্তু হৈ চৈ-এর আঁধিতে তার মূল ধরে টানাটানি।

"কিন্তু ভগবানের কৃপা তবু কাজ করে। দু' চার দিন বাদেই অনিত্য দেখা দিল নিজমূর্তিতে, টের পেলাম—মুক্তি মেলে না কালচার্ড কথালাপে, হাততালি কুড়িয়ে, সভাসমিতিতে নিখুঁত গান গেয়ে। এক কথায়, অতিষ্ঠ হয়ে উঠলাম বিবেকের বকুনিতে। পালাতেই হবে। কিন্তু ব্যূহের মধ্যে ঢোকা সহজ হ'লেও তা' থেকে বার হওয়া দায়। কী করি? ভাবনায় প'ড়ে গেলাম। এমন সময় ঘটল—যাকে আমি চিনেছি ঠাকুরের কৃপা বলে, কিন্তু আমার বুদ্ধিমান বন্ধুরা বলবেন—মরুক গে, শোনো'।

"চার পাঁচদিন বাদে এলাহাবাদে বন্ধুর সুন্দর বাংলোয় আমার জন্মদিনে খুব এক পার্টি হ'ল। ফের সেই ফুলের মালা, অভিনন্দন পাঠ, কালচার্ড কথালাপ, সায়েন্স সিনেমা শিল্পের জয়ধ্বনি। রাত্রে মনে ছেয়ে এল গভীর অবসাদ—কোথায় এসেছি কোথা থেকে? শ্যামঠাকুরের প্রিয় ভাগবতী শ্লোক মনে প'ড়ে গেল—'আয়ুষাং যদসদ্ব্যয়ঃ?' হঠাৎ স্বপ্নে দেখি কি, এক উজ্জ্বলকান্তি পুরুষ আমাকে বলছেন: 'এখনো মায়ার

মোহ ? কাল ভোরে উঠেই কাশী রওনা হও।' ব'লেই অন্তর্ধান। কি জানি কেন মনে হ'ল—ইনি আনন্দগিরি—সে কী সৌম্যমূর্তি—সাদা দাড়ি, পাকা চুল, কাঁচা সোনার রঙ ! ভোর তখন চারটে।

"স্থির করলাম—আর না : 'সময় এসেছে এবার এখন বাঁধন কাটিতে হবে।' কাউকে কিছু না ব'লে ঘণ্টাখানেক বাদে বেরিয়ে রাস্তা থেকে নিজেই এক ট্যাক্সি ডেকে এনে হলাম উধাও—'চলো কাশী'। সবদিক দিয়েই ধুমন্ত বন্ধুর নামে শুধু একটি চিঠি রেখে গেলাম। যা মনে করে করুক। আমাকে এরা আর ডাকবে না কোনোদিন—বলবে 'চাষা'। ভালোই তো—শাপে বর। কী হবে আমার এমন সব কালচার্ড বন্ধুদের নিয়ে যাদের কাছে মনের অন্তঃপুরের কথা বলতে পারি না—শুধু ঠুংরি গজল গেয়ে হাততালি কুড়োনো ? তা'ছাড়া মনে হ'ল বার বারই এই একটা কথা—যাঁর ডাকে শ্যামঠাকুর পৈতৃক ভিটে ছাড়লেন তাঁর ডাক আমার কাছেও হয়ত এই ভাবেই আসবে, ছাড়িয়ে নেবে আমাকে বাসনা-বন্ধন থেকে—পপুলার হবার লোভ থেকে—ত্যাগী না হ'য়ে ভক্ত সাজবার বিড়ম্বনা থেকে। এমনি ক'রেই তো বন্ধন খসে—তবে যখন ঠাকুর টানেন তখন লাগে বৈ কি—হোক না সে টান মুক্তির দিকে।

"এই সব আথান-পাথান ভাবতে ভাবতে মোটরে পৌছলাম কাশী। শ্যামঠাকুরের ওখানে যখন পৌছলাম তখন বেলা বারোটা। দেখি কি—তিনি ঠায় রোয়াকে দাঁড়িয়ে, আর তাঁর বাড়ির সামনেই রাস্তায় দাঁড়িয়ে সুধেন্দু মোক্ষম ঝগড়া করছে দু'টি ভুঁড়িওয়ালা বাবুর সঙ্গে। তাঁরা বলছেন : 'দেবই ওঁকে ঘাড় ধরে বের ক'রে।' সুধেন্দু বলছে আস্তিন গুটিয়ে বিশুদ্ধ কাশীর বাংলায় : 'চলা আও না। সুধেন্দুর জান থাকতে বঢ়ো না—আও দেখি একবার মরদের মুরদ।'

"আমি মোটরে হর্ন দিয়ে নামতেই ওরা চম্‌কে ফিরে দাঁড়ালো।

আমি সুধেন্দুর কাঁধে দিলাশা দিয়ে বললাম : 'ঠাণ্ডা হ'য়ে বলো তো ভাই, ব্যাপারখানা কী?' সুধেন্দু তাচ্ছিল্যের সুরে বলল: 'কী আবার? বাড়ি ভাড়া বাকি পড়েছে দু'দিন। জানোয়ার! জানে ওরা দিদির কী অবস্থা—' ব'লেই ফের রুখে উঠে ওদের দিকে তাকিয়ে 'বাড়ি-ভাড়া ঠাকুর কবে বাকি রেখেছেন শুনি? যা যা উল্লুক! এ কি মগের মুল্লুক না কি? ঘাড় ধরে বিদায় করবি? দে না একবার দে। চলা আও।' বাবু দু'টি ভয় পেয়ে দু'পা পেছিয়ে বলল: 'বে-আইনি? মারবেন না কি?' সুধেন্দু বলল: 'আলবৎ মারেঙ্গে। বাড়ি ভাড়া বাকি—তো নালিশ করগে যা—আইনে আছে নাকি বাড়ি ভাড়া না পেলে ঘাড় ধরে তাড়াবি?' আমি সুধেন্দুর পিঠ চাপড়ে বললাম: 'একটু ধীরে সুস্থে ভাই—' ব'লেই বাবু দুটির পানে চেয়ে বললাম: 'কত টাকা পাওনা আপনাদের?' শ্যামঠাকুর এতক্ষণ নিরুদ্বিগ্ন মুখে রোয়াকে দাঁড়িয়ে ছিলেন, শুধু দুটি ঠোঁট নড়ছিল—জপ করছিলেন, এই সময়ে রাস্তায় নেমে আমাকে বললেন: 'তুমি ব্যস্ত হয়ো না ভাই, আমরা পোটলা-পুঁটলি বেঁধে যাচ্ছিলাম ধর্মশালায় এমন সময়ে অন্নপূর্ণার ব্যথা উঠল—ওদের বললাম দুদিন সবুর করতে'—বলতেই বাবু দুটি মুখ ভেংচে বিশ্রী একটা গাল দিল। আর যাবে কোথা? সুধেন্দু লাফিয়ে উঠে ওদের দুজনের দুটি টেকো মাথা দুহাতে ধরে দমাশ ক'রে ঠুকে দিল। চিৎকার ক'রে ওরা দে দৌড়—'পুলিশ পুলিশ—খুন—খুন' করতে করতে। এ-অবস্থায় পুলিশের ফ্যাসাদে পড়া কিছু নয় ভেবে আমি তৎক্ষণাৎ মোটরে ওদের পিছু নিলাম। মিনিটখানেক বাদেই ওদের ধ'রে ফেললাম—ওরা তখনো হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটেছে ভুঁড়ি দুলিয়ে। মোটর একটা মোড়ে দাঁড় করিয়ে হেঁকে বললাম: 'শুনুন—ও মশায়—একটি কথা। পুলিশ ডাকবেন না।' ওরা আমাকে মোটর থেকে

নামতে দেখে দাঁড়াল। আমি এগিয়ে শান্তকণ্ঠে বললাম : 'শুনুন, পুলিশ ডেকে আপনাদের কী লাভ হবে—ভাড়া তো তাতে আদায় হবে না। ওরা আমার মোটর দেখে একটু থতমত খেয়ে গেল। ওদের মুখের সাদৃশ্য দেখে মনে হোল দুভাই ভুঁড়িতে এ বলে আমায় দেখ্, ও বলে আমাকে। ওদের মধ্যে বৃহত্তর ভুঁড়ি যাঁর তিনি বললেন সমীহ করে : 'কিন্তু কী করি বলুন মশায় ? বাড়িভাড়া না পেলে তো চুপ করে বসে থাকতে পারি না।' আমি বললাম : 'সে ব্যবস্থা হবে ? বলুন, বাড়িভাড়া কতদিনের বাকি ?' সে বলল : 'দুমাসের ছেষট্টি টাকা। আমি তৎক্ষণাৎ পকেট থেকে একশো টাকার একটি নোট বের করে তার হাতে গুঁজে বললাম : 'এই নিন দুমাসের পুরো ভাড়া। আর যদি কথা দেন যে ওকে আর বিরক্ত করবেন না অন্তত: আর এক মাস তবে এ-টাকা থেকে আর এক মাসের অগ্রিম রাখুন গচ্ছিত—কেবল কথা দিতে হবে।'

ওদের মুখের চেহারাই বদলে গেল, হাত জোড় ক'রে বলল : 'আমরা কী করব মশাই—আমাদেরও তো বেঁচে বর্তে থাকতে হবে—দুতিনটি বাড়িভাড়া থেকেই আমাদের সংসার চলে। তবে আপনি যখন শ্রীমুখে বলছেন যে উনি সাধুপুরুষ, তখন আর কথা কী ? আমরা আর ওঁকে তাগাদা দেব না—একমাস কেন, দুমাস থাকুন না স্বচ্ছন্দে। আমাদের কি অসাধ ? তা বলি কি আসুন না, পাশেই আমাদের বাড়ি—রসিদ দিচ্ছি—আর যদি কিছু মনে না করেন আমাদের ওখানেই এবেলা খেয়ে দেয়ে একটু জিরিয়ে নিন না—আহা শ্যামঠাকুরের মেয়েটির যে অবস্থা !'

"আমি মনে মনে হাসলাম। দরদ জাগতে একটু সময় নিল বৈ কি ! মুখে বললাম সুভদ্র সুরে : 'আমি পথে খেয়ে নিয়েছি ভাবনা নেই—কেবল রসিদ দিন।' মনে মনে ভাবলাম—হা রূপচাঁদ ! কী মায়াই জানো ঠাকুর !

বার্বারা উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল : "তারপর ?"

অসিত বলল : "রসিদ নিয়ে ফিরেই ছুটলাম ডাক্তারের খোঁজে, সুধেন্দু ধাত্রীর খোঁজে। ঘণ্টা তিনেকের মধ্যেই অন্নপূর্ণার প্রসব হয়ে গেল কিন্তু কাটাকুটি করে তবে। প্রসূতি বেঁচে গেল বটে, কিন্তু শিশুটি জন্মাবার কয়েক মিনিট পরেই মারা গেল।"

বার্বারার চোখ চিক চিক করে ওঠে : "আহা !"

অসিত একটু চুপ করে ওর দিকে চেয়ে থাকে। বার্বারা বলে : "তারপর দাদা !"

অসিতের চমক ভাঙে, বলে : "ও হ্যাঁ। তারপর আর কী, কমলা-দেবীর কী কান্না! অন্নপূর্ণার তখনো ক্লোরোফর্মের ঘোর কাটে নি। কিন্তু কমলাদেবী আমার সামনে এসেই শ্যামঠাকুরের পায়ে মাথা রেখে হু হু করে কাঁদতে লাগলেন। শ্যামঠাকুর তাঁর মাথায় হাত রেখে শান্ত কণ্ঠে বললেন : 'যিনি দিয়েছিলেন তিনিই নিলেন।'

এই সময়ে ধাত্রী ডাক দিল—কমলাদেবী চলে গেলেন—অন্নপূর্ণা জেগেছে। কিন্তু শ্যামঠাকুরের মুখে বিসন্নতার ছায়াও নেই, হাসিমুখেই বললেন : 'দেখলে তো ভাই! না, এখনো প্রমাণ চাই যে ঠাকুরটি আমার আর যাই করুন না কেন কথার খেলাপ করেন না—মারতে মারতেও রাখেন ?'

"তাঁর মুখে হাসি দেখে আমারও মন ভালো হয়ে গেল। আমি বললাম হেসে, ঈষৎ দুষ্টুমির সুরেই : 'এর নাম কি ঠাকুরের রাখা দাদা, না অ্যাক্সিডেন্ট ? ধরুন যদি আমি না আসতাম হঠাৎ ?'

শ্যামঠাকুর চোখ মিটমিটিয়ে হেসে বললেন : 'এসেছিলে কি ভাই সাধে ? গরজ বড় বালাই। স্বপ্নে কে দিল ধাক্কা—ভোরে উঠেই কাশী যাও ব'লে ?'

"আমার গায়ে কাঁটা দিল : 'তবে তিনি সত্যিই—'

"আর কে হ'তে পারে ভাই ? তিনি আমাকেও ব'লে গেলেন সব স্বপ্নে।" ব'লেই ফের তাঁর খোলা হাসি হেসে : 'পাঁকে ফেলতেও যিনি, টেনে তুলতেও তিনি—' বলতে না বলতে তাঁর কণ্ঠের সুর গাঢ় হ'য়ে এল—মুখে হাসি চোখে জল, বললেন : 'গাও না ভাই তোমার সেই গুরুবন্দনাটি যেটি প্রথম শুনি তোমার মুখে সেই হিন্দুমহাসভায়—আহা কী গান মীরার !—' বলেই হাত জোড় ক'রে চোখ বুজে গান ধ'রে দিলেন—আমারি শেখানো গান—

'হরী মিলনসে কঠিন হৈ মীরা আপনা সদ্‌গুরু পানা।
হরি করুণাসে খুলে জো নয়না—তো মন্ন গুরু পহচানা॥'

গাইতে গাইতে দু'গাল বেয়ে দর দর ক'রে ঝরতে থাকে অবিরল অশ্রুধারা—উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বেজে ওঠে সে কী অপরূপ সুর—রাস্তায় ভিড় জ'মে যায়। আমিও ধ'রে দিলাম গান তাঁর সঙ্গে

'ময় অনাথ গুরু নাথ হমারো, গুরু মেরো সঙ্গ সগাঈ।
হরী মিলায়ো গুরু মুঝে—গুরু হরিকী শরণ লগাঈ।'

* * *

বাবারার চোখে জল ভ'রে এল চোখ মুছে তপতীর দিকে চেয়ে বলল : "এ-লাইনগুলির মানে বুঝিয়ে দিতে দাদা ভুলে গেলেন!"

তপতী হেসে বলল : "দাদা অম্‌নি ভুলো। এর মানে হ'ল :

'হরি মিলনের চেয়েও কঠিন সদ্‌গুরুর মিলন।
গুরু চেনে সে-ই—হরির কৃপায় খুলেছে যার নয়ন।
গুরু হ'য়ে নাথ অনাথা মীরারে করে আশ্রয় দান
হরি এনে দিল গুরু পায়ে—গুরু দিল হরি সন্ধান।"

* * *

খানিক পরে বার্বারা মুখ তুলে অসিতের দিকে তাকালো: "গল্পটা কি এখানেই শেষ?"

অসিত বলল: "না, শ্যামঠাকুরের বিচিত্র জীবনে আরো অনেক কিছু ঘটেছিল—কিন্তু সে-গল্প আর একদিন করব। রাত বারোটা—কাফে ওরা বন্ধ করছে।"

ওরা তিনজনেই উঠে দাঁড়ায়। বার্বারা হঠাৎ বলে: "কেবল একটা কথা বলব দাদা—যদি রাগ না করেন?"

অসিত আশ্চর্য হ'য়ে বলল: "রাগ?"

বার্বারা একটু ভেবে বলে: "ব'লেই ফেলি। আপনার কাহিনী। আমি অবিশ্বাস করিনি দাদা, সত্যি বলছি—কেবল…কি জানেন? আমি যদি কোনোদিন গুরুবরণ করি তবে করব তিনি বিপদে-আপদে এভাবে রক্ষা করতে পারেন ব'লে নয়—ঐ যে মীরা বললেন, তিনি ভগবানের সন্ধান দিতেও পারেন—সেই জন্যেই।"

তপতী বলল হেসে: "বিপদে-আপদে রক্ষা পেতে যে গুরুবরণ করে তার গুরু করণই যে হয়নি ভাই! তবে এ-ও ঠিক যে, ভগবানের শক্তি আশীর্বাদ করুণা গুরুর মধ্যে দিয়ে সহজে সক্রিয় হ'তে পারে। তবে কেমন ক'রে এ হয়—সে-কথা তুমি এখনো বুঝতে পারবে না হয়ত। এ-সব ব্যাপারে না ঠেকলে শেখা যায় না।"

বার্বারা বলল: "কল্পনায় খানিকটা হয়ত বুঝি দিদি। কিন্তু সে-কথা যাক। আমার একটি শেষ জিজ্ঞাস্য আছে: গুরুবরণ হ'লে কি ভগবানের সন্ধান পাওয়া সত্যিই একটু সহজ হয়।"

অসিতই উত্তর দিল এ-প্রশ্নের: "হয়…কেবল…?"

বার্বারা সপ্রসন্ন নেত্রে তাকায়: "কেবল—?"

অসিত বলে : "মীরার গানেই ব'লে দিয়েছেন—গুরুর সদ্‌গুরু হওয়া চাই—বদ্‌গুরু হ'লে ভরাডুবি।"

বার্বারা বিস্মিত নেত্রে তপতীর দিকে তাকিয়ে বলে : "বদ্‌গুরু কী বস্তু, দিদি ?"

তপতী হেসে বলে : "আমি শুধু সদ্‌গুরুই জানি ভাই—পুঁজি কম। দাদার দু-রকমই দেখা আছে।"

—"প্রয়োজনের সম্বন্ধকে আমরা হৃদয়ের সম্বন্ধ দ্বারা শোধন করিয়া লইয়া তবে ব্যবহার করিতে পারি। ভারতবর্ষ কাজ করিতে বসিয়াও মানব সম্বন্ধের মাধুর্য্যটুকু ভুলিতে পারে না। এই সম্বন্ধের সমস্ত দায় স্বীকার করিয়া বসে। আমরা এই দায় সহজে স্বীকার করাতেই ভারতবর্ষ ঘরে-পরে, উচ্চনীচে, গৃহস্থে ও আগন্তুকে একটি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের ব্যবস্থা স্থাপিত হইয়াছে। এই জন্যই এদেশে টোল, পাঠশালা, জলাশয়, অতিথিশালা, দেবালয়, অন্ধ খঞ্জ আতুরদের প্রতিপালন প্রভৃতি সম্বন্ধে কোন দিন কাহাকেও ভাবিতে হয় নাই। আজ যদি এই সামাজিক সম্বন্ধ বিশ্লিষ্ট হইয়া থাকে, যদি অন্নদান, জলদান, আশ্রয়দান, স্বাস্থ্যদান, বিদ্যাদান প্রভৃতি সামাজিক কর্ত্তব্য এই সমাজ হইতে স্খলিত হইয়া বাহিরে পড়িয়া থাকে, তবে আমরা একেবারেই অন্ধকার দেখিব না।"

—রবীন্দ্রনাথ

মরূদ্যান

সুবোধ বসু

দামোদরের উদরের মধ্য দিয়া আধ মাইল চলিয়া আসিবার পর তবেই সুশান্ত মোটর-চালককে গাড়ি থামাইবার আদেশ দিল। নিজেই গাড়ির দরজা খুলিয়া আমার দিকে চাহিয়া কহিল, 'নামুন না একবার, মণীশদা। দেখে যান কি রকম আরামের কাজ ক'রে জীবিকার্জ্জন করিতে হয়।···আমাকে কয়েক মিনিটের জন্য একবার খবরদারি করে' চাকরি রক্ষা করতে হবে···'

'তুমি স্বচ্ছন্দে তা রক্ষা করে' আসতে পার, কিন্তু এই মরুভূমিতে আমি পদক্ষেপমাত্র করতে চাই না।' আমি গাড়ির নির্ভরশীল অভ্যন্তর হইতে নড়িবার সামান্যমাত্র আগ্রহ প্রকাশ না করিয়া কহিলাম। 'দুপুর বেলা এরা সব এর মধ্যে কাজ করে কি করে', মরে' যায় না? ··'

'রৌদ্র, বালি, গরম এ-সব মজুরদের, এবং কিছুটা আমাদেরও, গা-সহা হয়ে গেছে।' সুশান্ত গাড়ি হইতে বালুতে অবতরণ করিয়া কর্ম্মরত জনতার দিকে চাহিয়া কহিল। 'আপনি তবে গাড়ির ভেতরেই থাকুন, আমি দশ-পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ফিরে আসব···'

'তা এসো।' আমি কহিলাম। 'সকাল নটায়ই এই রোদ, আরেকটু চড়লে চোখ মেলে তাকানোই মুস্কিল হবে যে···'

সুশান্ত একটু হাসিয়া সোলার টুপিটা হাত হইতে মাথায় স্থানান্তরিত করিল ও দু'তিন শ গজ দূরে নদী-সৈকতে যেখানে বহু মজুর ও মজুরদের কাজের তত্ত্বাবধানকারীরা ভিড় করিয়া কংক্রিট ঢালাইয়ের কাজে ব্যস্ত ছিল, সেদিকে যাত্রা করিল।

সুশান্ত আমার ছোট শ্যালক এবং দৃশ্যমান কাজের ভারপ্রাপ্ত এগ্‌জিকিউটিভ্‌ এঞ্জিনীয়ার। বালির মধ্যে চলিতে তার কোনই অসুবিধা হয় না। তবু পথ সংক্ষিপ্ত করিবার উদ্দেশ্যে নদীবক্ষে থাম জমাইবার জন্য লোহার রড্‌ দিয়া কংক্রিট ঢালিবার যে-সব খুপ্‌রি তৈরি করা হইয়াছে তাহার উপর দিয়া সে অবলীলাক্রমে হাঁটা সুরু করিল। এর দুটো খুপ্‌রি পার হইবার আগেই আমি ভিরমি খাইয়া পড়িয়া যাইতাম, কিন্তু এঞ্জিনীয়ারের কাছে এ কিছুই নয়।

এইবার চারিদিকে চাহিয়া পরিপ্রেক্ষিতটা নজরে আনিতে চেষ্টা করিলাম। সামনে-পিছনে, ডাইনে-বাঁয়ে যেদিকেই তাকাই শুধু বালুময় নদী-সৈকত। শীত-ঋতুর দরুণ ও মানুষ কর্তৃক স্তূপীকৃত মাটি ও বালুর চাপে দামোদরের জীবন-স্রোত এখান হইতে বহু দূরে ধিকি ধিকি করিয়া বহিতেছে মাত্র। আমার গাড়ি হইতে এই জলরেখা নজরে আনাই প্রায় কঠিন। যাহা অপর্য্যাপ্তভাবে নজরে পড়িতেছে তাহা অনন্তব্যাপী বালুকা এবং বালুকাবক্ষে যেন রাক্ষস-সন্তানের মতো বিচিত্রাকার ও সতত গর্জ্জমান অসংখ্য মোটর-যান—কোনটা ক্রেন্‌ উৎক্ষিপ্ত করিতেছে বা গুটাইয়া লইতেছে, কোনওটা বৈদ্যুতিক শোভেলে প্রস্তরখণ্ড তুলিতেছে বা ঢালিয়া দিতেছে, কোনওটা বা বুনো শুয়োরের মত হুঙ্কার করিয়া সৈকতের বুক হইতে মাটি উপ্‌ড়াইয়া তুলিতেছে। যেন এক বিরাট ও অশুভ ষড়যন্ত্রের দিগন্তব্যাপী মহড়া। অথচ এই প্রচেষ্টার পিছনে জনকল্যাণের কত বড় একটা উদ্দেশ্য রহিয়াছে—পাগ্‌লা নদীর খামখেয়ালের হাত হইতে মানুষকে বাঁচাইবার জন্য বুদ্ধি ও পরিশ্রমের ইহা কি প্রকাণ্ড পরিচয়, তাহা ভালো করিয়াই জানি।

অসংখ্য যন্ত্র ও যান্ত্রিকের কর্ম্ম-ব্যস্ততার উপর দিয়া তাকাইয়া দেখিলাম, নদীর বুকে একুশটা বিরাট থাম খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়াছে —দুর্দ্দম নদী-স্রোতকে বাধা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। আরও অনেকগুলি থাম এখনও তৈরি হইতে বাকি। এগুলি নির্ম্মিত হইলে থামগুলির মধ্যে বন্যারোধকারী কপাট বসাইয়া দেওয়া হইবে। নদীর জলের চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হইবে। নদীকে শাসন করা যাইবে মানুষের প্রয়োজনে।

মানুষের সুবিধার দিক হইতে ইহা মস্ত বড় কাজ সন্দেহ নাই। আমার আপত্তি আমার বর্ত্তমান পরিবেশ সম্বন্ধে। এমন ছায়ালেশহীন কড়া রৌদ্র, সবুজের স্পর্শহীন এমন বালুকাবিস্তার প্রাগৈতিহাসিক জন্তু-জানোয়ারের মত কিম্ভূতাকার এই সব গাড়ি ও যন্ত্র, অসংখ্য পিপীলিকার সারির মত মানুষের এই অবিরাম চঞ্চলতা—এসবে আমি অভ্যস্ত নই। এগুলি যেন আমার মাথা ধরাইয়া দিবার উপক্রম করিল। যেন গলা শুকাইয়া উঠিল, জল পান করিতে পারিলে যেন স্বস্তি বোধ করিতাম। বালুকাবক্ষে রৌদ্র প্রতিফলিত হইয়া চোখ ধাঁধাইয়া দিবার উপক্রম করিল।

অথচ সুশান্তর ফিরিবার নাম নাই। দশ মিনিটের জায়গায় অন্তত আধঘণ্টা কাটিয়াছে; আরও কতক্ষণ কাটিবে তার নিশ্চয়তা কি। আমাকে যে আদত একটা মরুভূমির মধ্যে বসাইয়া রাখিয়া গিয়াছে তাহা হয়তো এতক্ষণে আর তার স্মরণ নাই। এ অবস্থায় নির্ঘাৎ বিপন্ন বোধ করিতাম, জলতৃষ্ণা দুর্ব্বার হইয়া উঠিত, রৌদ্রদীপ্ত বালুর বিস্তারে মরুভূমির পথভ্রান্ত পথিকের মত অসহায় বোধ করিতাম যদি না জানিতাম যে, আমি আদেশ করিলেই মোটরচালক দু'মিনিটের মধ্যে আমাকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছাইয়া দিবে। এই ভরসাই আমাকে এই

তপ্ত গন্ধময় কষ্টকর পরিবেশ সহ্য করিবার শক্তি দিল। আশু অসুবিধা-গুলি উপেক্ষা করিয়া চারদিকের কর্ম্মতৎপরতা লক্ষ্য করিবার চেষ্টা করিলাম। এ রকম অভিজ্ঞতা তো সব সময়ে হয় না; যখন হইয়াছে, তখন তাহার সদ্‌ব্যবহার করিয়া লই না কেন।

আমার গাড়ির অদূরে একটা প্রকাণ্ড কংক্রিট-মিক্‌সার কাজ করিতেছিল। কলিকাতায় দালান তৈরীর সময় এদেরই ছোট ভাইদের কংক্রিট ও পাথর-কুচি মিশাইতে দেখিয়াছি, সুতরাং এই বড়দাটিকে চিনিতে খুব কষ্ট হইল না। শীঘ্রই ইহাকে সিমেণ্ট ও পাথরচূর্ণের খিচুড়ি নিষ্কাশণ করিতে দেখিলাম।

অনতিবিলম্বে কংক্রিট গাঁথিবার এই অপরিহার্য্য মস্‌লাটির ঢালাইয়ের জায়গায় যাইবার পদ্ধতিটাও নজরে পড়িল। কুলি-মেয়েদের প্রবহমান দুইটা অখণ্ড পংক্তি একটা কংক্রিট মিক্‌সারটির কাছ হইতে নির্ম্মীয়মান থামগুলির দিকে ও অপরটি পূর্ব্বোক্ত স্থান হইতে কংক্রিট-মিক্‌সারের দিকে প্রসারিত। কামিনদের কোমরে গামছা জড়ানো, মাথায় গামছার গুণ্ঠন। তপ্ত বালি হইতে পা বাঁচাইবার জন্য দু' একজন চটির মত কিছু পায়ে পরিয়া আছে, তবে অধিকাংশই নগ্নপদ। একবারে দু'তিনটি করিয়া কামিন এই যন্ত্রটির কাছে আগাইয়া আসে ও মাথার শূন্য কড়াইগুলি নামাইয়া দেয়। যন্ত্র-নির্গত মস্‌লার স্তূপের মধ্যে যে মজুর দুটি শোভেল উদ্যত করিয়া দণ্ডায়মান, তারা মস্‌লা দিয়া কড়াই পূর্ণ করিয়া দিলে তাহা কামিনেরা আবার মাথায় উঠাইয়া কাজের জায়গায় লইয়া যায়। প্রায় যন্ত্রের মত ছেদহীনভাবে এই দেওয়া নেওয়া চলিতেছে। এরই মধ্যে কুলি-মেয়েরা হাসে, চোখ টেপাটেপি করে, গল্পগুজব চালায়। কুলিরা ঠাট্টা-মস্করা করে। যেন এই রুক্ষ পরিবেশে কোনও অসুবিধাই বোধ করিতেছে না।

মস্‌লার পরিবেশকদের মধ্যে বয়সে যেটি ছোকরা, তার কর্ম্ম-তৎপরতাটাই বিশেষ করিয়া চোখে পড়িল। রীতিমত স্মার্ট ছোক্‌রা। ইহার স্বচ্ছন্দভাব দেখিবার মত। কাজে ফাঁকি দিবার মতলব নাই। তার সাথী একটা কড়াই পূর্ণ করিতে না করিতে সে তিনটা কড়াই ভরিয়া ফেলে।

পাৎলা একহারা বিহারী যুবক। মেদহীন বানানো শরীর। ঘামে-ভেজা ছিটের বুশ্‌-শার্টের ভিতর দিয়া দেহের সবল রেখাগুলি স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। সুগঠিত পায়ে গাম্‌ বুট, হাতে শোভেল্‌, কপালে ঘাম, মাথায় রোদ। পাথর ও কংক্রিটের স্তূপের মধ্যে যেন বীর যোদ্ধা মাটি ফুঁড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে।

স্বাস্থ্য ও কর্ম্মশক্তির সত্যিকারের পরিচয় পাইতে হইলে যেখানে মজুরেরা কাজ করে সেখানে আসিতে হয়। কারখানায়, কৃষিক্ষেত্রে, মাল চলাচলের জায়গায় ইহার হাজার পরিচয় ছড়ানো। ইহা সহসা আমাদের মত শহুরে লোকের চোখে পড়ে না, ইহাই দুঃখ। দামোদরের দিগন্তবিস্তৃত বালুকাসৈকতের মধ্যে অসহায়ভাবে অপেক্ষমান আমার চোখের সামনে এমনি একটি উদাহরণ প্রায় জোর করিয়া আত্মপ্রকাশ করিল।

ঠিক কতক্ষণ ইহার কাজ লক্ষ্য করিয়াছিলাম, বলিতে পারিব না। এই প্রচণ্ড রৌদ্র ও চোখ-ধাঁধানো বালিতে পাঁচ মিনিটকে দু'ঘণ্টা বলিয়া বোধ হইতেছিল। ইতিমধ্যে কতবার যে সুশান্তর কাজের জায়গার দিকে অধৈর্য্য দৃষ্টিপাত করিয়াছি, কতবার যে অদূরে গল্পরত মোটরচালকের দিকে ভীতভাবে চাহিয়া কাণ্ডারী আমাকে পরিত্যাগ করে নাই সে সম্বন্ধে নিশ্চিত হইতে চেষ্টা করিয়াছি, তার ইয়ত্তা নাই। এরই ফাঁকে এক সময় সেই মজুর ছোকরার বিশ্রামের পালা আসিয়াছে। চাহিয়া দেখি, অন্য লোক আসিয়া তার স্থান গ্রহণ করিয়াছে।

মিনিট কয়েক ছোক্‌রা কংক্রিট-মিক্‌সারের আড়ালে ঢাকা পড়িয়াছিল, এইবার দেখিলাম সে এদিকে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। পায়ের গাম্‌-বুট খুলিয়া ফেলিয়াছে। বাঁ হাত দিয়া কপালের ঘাম মুছিয়া দু'বার সে আড়মোড়া ভাঙিয়া দাঁড়াইল। এর বিশ্রামের পদ্ধতিটা দেখিবার জন্য আমি উৎসুক হইয়া রহিলাম।

বেশি বিলম্ব হইল না। দেখিলাম, বছর আঠারো-উনিশের একটি হিন্দুস্থানী কামিন গামছা দিয়া ঢাকা একটা বাল্‌তি লইয়া হাজির হইয়াছে।

ছোক্‌রা ইহার জন্য প্রস্তুত হইয়াই ছিল, কোনও দিকে না তাকাইয়াই সে বালুর উপর উবু হইয়া বসিল ও মেয়েটা সাবধানে তার হাতের আঁজলায় জল ঢালিয়া দিলে সে প্রথমে এই জলে ভালো করিয়া হাত, মুখ ও মাথা ধুইয়া লইল এবং পরে সেই একই পদ্ধতিতে আকণ্ঠ জল পান করিয়া এইবার সর্ব্বপ্রথম মেয়েটার দিকে মুখ তুলিয়া বেশ একটু তৃপ্তির হাসি হাসিল। অর্থাৎ এতক্ষণ তাতিয়া পুড়িয়া যে কষ্ট পাইয়াছি, এই জল-সিঞ্চনে তাহা সম্পূর্ণ দূর হইয়াছে। ইহার তৃপ্তিটা আমি প্রায় নিজ দেহে অনুভব করিলাম। তপ্ত বালুব মরুভূমিতে জলধারা যে কত মধুর, তাহা অনুমান করিতে আমার কিছুমাত্র কষ্ট হইল না। মোটর গাড়ির অভ্যন্তরে গদির আরামে বসিয়াও আমার গলা শুকাইয়া আসিবার উপক্রম হইয়াছিল।

'একটু দেরি হয়ে গেল, মণীশদা...'

চমকিয়া কংক্রিট-মিক্‌সারের দিক হইতে গাড়ির দরজার কাছে দৃষ্টি টানিয়া আনিলাম। কহিলাম, 'একটু নয়, বেশ একটু। আমি সহ্যের শেষ ধাপে এসে পৌঁচেছি; তেষ্টায় চারদিকে মরীচিকা দেখা শুরু করেছি। এমন সময় একটা মরুদ্যান চোখে পড়ে গেল। ঐ চেয়ে দেখ...

গাড়ির দরজা খুলিয়া প্রবেশ-উদ্যত সুশান্তকে বাধা দিয়া কংক্রিট-মিশ্রণের যন্ত্রটার দিকে দেখাইলাম।

'তোমাদের সারাটা কাজের সাইটে কোথাও যে ছায়া আছে, শত চেষ্টা করেও এর আগে তা আবিষ্কার করতে পারিনি। কিন্তু যারা চেনবার তারা ঠিক চিনে নিয়েছে।' কুলি তরুণ-তরুণীদ্বয়ের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াই কহিলাম। 'কংক্রিট-মিক্সার যেন এদের জন্যই তার পায়ের কাছে এই ছায়াটুকু নিক্ষেপ করেছে—রসিক যন্ত্র বটে! কিছু মনে কোরো না, ভায়া, দেখে মনে হচ্ছে, একটু যেন প্রেমালাপ চলছে। এই দুস্তর বালুর রাজ্যের পক্ষে যা অভাবনীয়। একটু আগেই মেয়েটা বাল্‌তি থেকে ছোক্‌রাকে খাওয়ার জল ঢেলে দিচ্ছিল…'

সুশান্ত সেদিকে একবার তাকাইয়া একটু হাসিয়া গাড়িতে প্রবেশ করিল। ড্রাইভারকে কহিল, 'চলো—কোঠি।…আপনাকে আগে নামিয়ে দিয়ে আসি, মণীশদা। আমার আরও ঘণ্টা দেড়েকের কাজ আছে সাইট্‌-অফিসে। আপনি অতক্ষণ থাকতে পারবেন না…'

'সে চেষ্টা করতে আমার কোনই উৎসাহ নেই।' আমি গম্ভীর ভাবেই কহিলাম।

গাড়ি কংক্রিট-মিক্সারের কাছাকাছি পৌছিল। মরূদ্যানটির দিকে সকৌতুকে তাকাইয়া ছিলাম, দেখিলাম সেই কুলি-ছোক্‌রা ও কুলি-মেয়ে দুজনেই উঠিয়া দাঁড়াইয়া সুশান্তের প্রতি সসম্ভ্রম অভিবাদন জানাইল। এটা কিছু বিশেষ ব্যাপার নয়, সারা রাস্তায়ই এই সম্মান-প্রদর্শন চলে। তবু একটু ব্যতিক্রম লক্ষ্য করিলাম। সুশান্ত টুপিতে ডান হাতের তর্জ্জনী ছোঁয়াইয়া এই নমস্কার গ্রহণ করিল। আমার দিকে ফিরিয়া কহিল, 'এদের নতুন বিয়ে হয়েছে। সে এক ব্যাপার! আপনি ঠিক বলেছেন, এ মরূদ্যানই বটে…'

'কিন্তু ব্যাপারটা কি?' কলকব্জার রাজ্যে রসের আভাস পাইয়া যেন স্বাভাবিক বোধ করিলাম।

'এই মেয়েটাকে বিয়ে করবার জন্ত এই কুলি-গ্যাঙ্গের সর্দ্দার ক্ষেপে উঠেছিল। লোকটা মধ্যবয়স্ক বিপত্নীক।...বাঁ দিকে চেয়ে দেখুন, ঐ পিলারটার কাছে দাঁড়িয়ে শ্যেনদৃষ্টিতে কাজ লক্ষ্য করছে—ঐ যে গোঁফ-ওয়ালা নীল ফতুয়া গায়ে লোকটা।...নিজের সন্তানের বয়সী এই মেয়েটার উপর এর নজর পড়ে গেল। প্রথমে তো মেয়েটার কাছেই প্রস্তাব করলে। কিন্তু সে রাজি হলো না। তখন তাকে ও তার মাকে পর্য্যন্ত ভয় দেখানো শুরু হলো—অর্থাৎ আমার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিলে এত টাকা দেব। এত রূপোর গয়না দেব মেয়েকে। আর রাজি না হলে দিন-মজুরী যাবে, আমার লোক দিয়ে মেয়েকে অপমান করাবো, এই সব। বুড়ী এই উভয় চাপে পড়ে একটু রাজী হবার মত ভাব দেখালো। মেয়েকে পীড়াপীড়ি চললো। কিন্তু মেয়ে নারাজ! সর্দ্দার বল্লে, দাঁড়া মুন্নীকে আমিই শায়েস্তা করছি। ধনিয়ার সঙ্গে তার আস্‌নাই চলছে। আগে তার কাজ খতম করি। বোকা ছুঁড়ী, কি আছে ধনিয়ার? দেশে আমার ঘর আছে, ক্ষেত-খামার আছে, গাই-ভৈঁস আছে, গয়না-তৈজস আছে। এখানেই বা আমার সম্মান কত! কাজ থেকে তাড়িয়ে দিলে ধনিয়াটা খাবে কি?...সত্যই একদিন ধনিয়ার দিন-মজুরি ঘুচল। সর্দ্দারের সাগরেদ্‌রা মুন্নীর পেছনে পেছনে তাকে ভয় দেখিয়ে ফিরতে লাগল...'

'ওরে বাবা, এ যে দেখি একেবারে নাটক!' আমি কহিলাম। 'তারপর ভিলেইন্‌কে কি করে' জব্দ করে' হেরো নায়িকা লাভ করলে?...'

'একদিন সন্ধ্যাবেলা মুন্নী সরাসরি আমার বাংলোতে এসে হাজির।' সুশান্ত শান্ত-কণ্ঠে বলিল। 'কুলিমেয়ে সরাসরি বড় সাহেবের বাংলোতে

এসে তার সঙ্গে দেখা করতে চাইবে, এটা অভাবনীয় ব্যাপার। আমার চাপরাশী আটকে দিলে। আমি চা খাচ্ছিলাম, কান্নাকাটি শুনে তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে এলাম। মেয়েটা ছুটে এসে পায়ে উপুড় হ'য়ে পড়ল। একবার ভেবে দেখুন কি অবস্থা! কোনও রকমে তো উঠিয়ে দাঁড় করালাম। জিজ্ঞেস করলাম, কি হয়েছে। তখন সে আশ্চর্য্য রকম অলজ্জিত কণ্ঠে তার কাহিনীটা আগাগোড়া বিবৃত করলে। বল্লে, "হুজুর, এ রকম জবরদস্তি আপনার এলাকায় হবে? আমি যাকে কথা দিয়েছি, তাকে সাদী না করলে আমার ধরম কোথায় থাকে? অথচ আমার জন্য আজ এক হপ্তা হলো তার দিন-মজুরি বন্ধ হয়েছে, এমন জুলুম। আপনি মালিক, আপনি আমাদের রক্ষা না করলে কে রক্ষা করবে?"...আপনি ভাবতে পারবেন না, মণীশদা, কি রকম স্পষ্ট ভাবে এই অশিক্ষিত মেয়েটা তার বক্তব্য জানালো। যেন অকৃত্রিম ভালোবাসার জোরে সকল লজ্জা, সকল ভয়, সকল বিপদ তুচ্ছ করে' সে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পেরেছে। সে এক দৃশ্য! কত বড় নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা থাকলে একটা সামান্য কামিন এমন সাহস দেখাতে পারে, একবার ভেবে দেখুন। বল্লাম, "সেই ছেলেটা কোথায়? ডেকে নিয়ে আয়।" আশার আলোয় পলকে তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। খুশিতে সেলাম ক'রে এইবার সে সলজ্জিতভাবে বল্লে, "সে কাছেই আছে, হুজুর। ডেকে আনি।" বলে ছুট লাগালে...'

'তারপর "হুজুর" খুশি হয়ে বাকি সব ব্যবস্থা করে দিলেন তো?' আমি কহিলাম।

'তা তো স্বচক্ষেই দেখে এলেন।' মৃদু হাসিয়া সুশান্ত কহিল। 'যান, এই তো বাড়িতে পৌঁছে গেছেন। খুব চেঁচিয়ে ঠাণ্ডা শরবত ফরমাস করুন গিয়ে, অনেকক্ষণ মরুভূমিতে বসিয়ে রেখেছি...'

'না হে ভায়া', স্তব্ধগতি গাড়ি হইতে বাড়ির সিঁড়িতে পা বাড়াইয়া কহিলাম, 'তোমাদের একটু কড়া করেই বিচার করেছিলাম, মনে হচ্ছে। তোমাদের এই বালুতেও তা হলে সবুজ ঘাস জন্মায় দেখছি। সবটাই নিরস নয়…'

—"বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কালে সাহিত্যের এবং কলাসৃষ্টির যে বিশেষ রূপ, তাহাদের অস্তিত্বের কারণ তত্ত্বের যৌক্তিকতায় ততখানি নহে, যতখানি ইতিহাসের আবর্ত্তনে। এই যে ইতিহাসে আবর্ত্তন তাহা একেবারেই অন্ধ বা খামখেয়ালী নহে। তাহার অন্তরাবেগের ভিতরেই নিহিত থাকে একটা গভীরতর তত্ত্ব, একটা গভীর সঙ্গতি। বিশ্বসৃষ্টি যেমন কোন মতবাদের দ্বারা গড়িয়া ওঠে নাই, অথচ তাহার প্রতিটি সৃষ্টবস্তুর ভিতরে নিহিত আছে কত তত্ত্ব, কত যুক্তি এবং সঙ্গতি, একটু ব্যাপক এবং গভীর দৃষ্টিতে দেখিলে দেখিতে পাইব, সাহিত্য সৃষ্টিও অনেকখানি সেইরূপই।"

—রবীন্দ্রনাথ

ধেনুপদর কথা

—চক্রধর—

কলকাতা থেকে ট্রেনে গেলে আধ ঘণ্টার বেশী পথ নয়, কিন্তু ভদ্রলোকের বাড়ী দেখে আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম।

গ্রাণ্ড্ ট্রাঙ্ক রোডের পাশেই ছোট্ট বাড়ীটি। ঘর মোটে খান-চারেক; কিন্তু সে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। বারান্দায়, ঘরে, সিঁড়িতে সর্ব্বত্রই গরুর ছবি। কোনটি ফটো, কোনটি হাতে আঁকা, কোনটি পশমে বা রঙিন সূতায় বোনা। পিঁজরাপোলের গরুর ছবি, গো-রক্ষিণী সভার গরুর ছবি, এক্‌জিবিসনের গরুর ছবি, এই সব। সদর দরজা পার হয়ে দালানে ওঠবার মুখে একটা বড় গরুর রঙিন্ ছবি—যার মধ্যে তেত্রিশকোটী দেবতা নিরাপদে বাস করছেন।

ভদ্রলোকের নাম আগে ছিল রেণুপদ মুখোপাধ্যায়। এখন নামটি ঈষৎ বদলে ধেনুপদ করেছেন। ভদ্রলোকের একটি ছেলে ও একটি মেয়ে। ছেলেটির নাম গোবর্দ্ধন, মেয়েটির নাম নন্দিনী। বশিষ্ঠের গাভী নন্দিনীর মানবী সংস্করণ। স্ত্রীর নাম ছিল অম্বাবতী। ভদ্রলোক এখন গো-ডাকের অনুকরণে আদর করে নাম রেখেছেন হাম্বাবতী। কিন্তু সে নাম কোথাও ব্যবহার করতে স্ত্রী একান্ত নারাজ। সুতরাং একমাত্র স্বামীর মুখেই ঐ নাম কদাচিৎ শোনা যায়, অবশ্য তাও লোকজনের অসাক্ষাতে।

বাড়ীর নামটিও রেখেছেন বেশ, গোকুলধাম। মাঝে মাঝে সেখানে গো-রক্ষিণী সভা বসে। ধেনুপদবাবু নিজেই তার সভাপতি। বাড়ীর

চাকরটির নাম গোপাল। ঝিয়ের নাম গোলাপী। গোয়ালে অনেকগুলি গরু। ঘটা করে' গো-পার্ব্বন করে' থাকেন। কৌতূহলবশে ধেনুপদবাবুকে জিজ্ঞাসা করে ফেল্‌লাম: আপনি গরুর নাম নিয়ে এত সমারোহ করেছেন কেন বলুন তো? তা ছাড়া আপনার গোয়ালে দু' দুটো গরুর শিং রূপো দিয়ে বাঁধিয়ে রেখেছেন দেখছি। ব্যাপার কি?

ধেনুপদবাবু একটু হাসলেন। গোভক্তির প্রশান্ত হাসি। ধীরে ধীরে বললেন: গরুর মত উপকারী প্রাণী জগতে দুর্লভ।

কথাটা স্কুলপাঠ্য বইয়ের গরু-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধের একটা লাইনের মত শোনা'ল। ধেনুপদবাবু দেওয়ালে টাঙানো একটি গরুর ছবিকে যুক্ত করে প্রণাম করে বললেন: একদিন গরুর জন্যেই ফিরে পেয়েছি আমার জীবন, আমার স্ত্রী-পুত্র-কন্যার জীবন। সে এক আশ্চর্য্য কাহিনী।

কাহিনীটি শোনবার জন্য বেশ একটু ঔৎসুক্য হো'ল। আমার আগ্রহ দেখে ধেনুপদবাবু আরম্ভ করলেন:

স্ত্রীর হাঁপানীর অসুখের জন্যে সন্ধান পেলাম একটা স্বপ্নাদ্য মাদুলির। বর্দ্ধমান জেলার মেমারী ষ্টেসন থেকে উত্তরে সাত আট মাইল গরুর গাড়ীতে গেলে সেই স্বপ্নাদ্য মাদুলির গ্রাম। মধ্যে 'বাঁকা' নদী নামে একটি নদীও পার হতে হবে। ঔষধটি শুনেছিলাম একেবারে অব্যর্থ। রোগীকে সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। লোক মারফতে বা ডাকযোগে আনা চলবে না।

অগত্যা স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে দু'টীকে সঙ্গে নিয়ে স্বপ্নাদ্য মাদুলির উদ্দেশ্যে সকালের ট্রেণেই রওনা হ'লাম। মেমারী ষ্টেসনে যখন নামলাম, বেলা তখন প্রায় এগারটা হবে। ষ্টেসনেই কিছু জলযোগ করে নিলাম। গরুর গাড়ীও ভাড়া করা হোল'। গরু দুটী বেশ নধর-কান্তি—বড় বড় শিং-ওলা। গাড়োয়ানটির চেহারাও ষণ্ডা-ষণ্ডা গোছের। তবে কথাবার্ত্তায় বেশ চতুর ও বিনয়ী বলেই মনে হোল'।

ছেলেমেয়ে দু'টী ত পরমানন্দে গো-যানে গাড়োয়ানের ঠিক পাশটিতে বসে' নানা দৃশ্য দেখতে দেখতে ও নানা প্রশ্ন করতে করতে যাচ্ছে। বড় বড় মাঠ পার হয়ে নির্জ্জন বনের পাশ দিয়ে যেতে মাঝে মাঝে মনটা অজানা ভয়ে কেঁপে উঠছিল। দূরে দূরে দু' একটা ছোট গ্রাম। তা'ছাড়া ও-দিকটায় বিশেষ লোকালয় ছিল না। বাঁশঝাড়, আশ্‌শেওড়ার ঝোপ, বৈঁচি গাছের জঙ্গল, এই সব পথের দু'পাশে ছড়িয়ে আছে। 'কাশ' ও 'কেশে' ঝোপের ধারে দু' একটা পঙ্কিল ডোবাও চোখে পড়ল।

বেলা প্রায় একটা। ধূধূ তেপান্তর মাঠে চোখ ঝলসানো দারুণ রৌদ্রে খেঁজুর ও তালগাছগুলো যেন দৈত্যের মত দাঁড়িয়ে আছে। দুপুর বেলায় মাঠে কোথাও জনপ্রাণী দেখতে পেলাম না। ক্রমে গরুর গাড়ী এসে দাঁড়াল 'বাঁকা' নদীর ধারে। নির্জ্জন আবাটা, কেউ কোথাও নেই।

গাড়োয়ান বলল: গাড়ী এবার খুলে দি বাবু। গরু দুটোকে একটু জল খাইয়ে নি। তোমরা খানিক এই আমতলায় একটু জিরিয়ে নাও, আমিও কিছু খেয়ে আসি।

—কোথায় যাবে তুমি? একটু সন্দিগ্ধ স্বরেই প্রশ্ন করলাম আমি।

—উই হোথাকে—আমার ভাই কাঠ কাটচে উ বনে। উর সাথে ভাত আছে, খাব।—গাড়োয়ান বল্‌ল।

'বাঁকা' নদীর তীরে নির্জ্জন বনের ধারে আমাদের রেখে গাড়োয়ান চলে গেল।

আমার স্ত্রী একবার প্রশ্ন করল: হ্যাঁ গা, গাড়োয়ান যে আমাদের এই জঙ্গলে ফেলে চলে যাচ্ছে।

গাড়োয়ান ততক্ষণে ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

ছেলেমেয়ে দু'টী চুপ করে বসে আছে।

গাড়ী থেকে গরু দুটোকে খুলে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল কাছের মাঠে।

সেখানে তারা মুখ নীচু করে ঘাস খাচ্ছে। গলায় কিন্তু দড়ি বাঁধা আছে, তবে গাড়ীর বন্ধন থেকে তারা মুক্ত। বড় বড় কালো শিং দুপুরের রৌদ্রে চক্ চক্ করছে। মাছি তাড়াচ্ছে লেজ পিঠের উপর বুলিয়ে বুলিয়ে। ঘাস ছিঁড়ে খাবার শব্দও বেশ শোনা যাচ্ছে। আকাশ তামার মত ফিকে নীল। কখন কখন দু'একটা শঙ্খচিল উড়ে যাচ্ছে পূব থেকে পশ্চিমে। কোথায় যেন কাঠ্-ঠোকরা পাখীর ঠক্ ঠক্ শব্দ শোনা যাচ্ছে। দুপুরের উগ্র রৌদ্রে মাঠের উপর দিয়ে যেন আগুনের হল্কা বহে যাচ্ছে।

আমরা চুপচাপ বসে আছি, গাড়োয়ানের আসার অপেক্ষায়। মাঝে মাঝে বাতাসের হু হু শব্দেও যেন চম্‌কে উঠ্‌ছি। ফিরে দেখ্‌ছি সে আসছে কিনা।

হঠাৎ নজর পড়ল, গাড়োয়ান আসছে, কিন্তু একা নয়। সঙ্গে বণ্ডামার্ক গোছের কে একজন লোকও রয়েছে। ওদের হাতে চক্ চক্ করছে ও দুটো কি? রাম দা? রাম দা কেন? সর্ব্বনাশ! তা'হ'লে—

দারুণ ভয়ে আমাদের হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হো'ল। নির্জ্জন স্থানে জঙ্গলের মাঝে কে আমাদের রক্ষা করবে? ওরা ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে। এবার এসে গাড়ীর পাশে দাঁড়াল ওরা। ওদের মুখে যেন একটা বীভৎস ভাব ফুটে উঠেছে। আমার স্ত্রী ঐ দেখে কেঁদে উঠল,—আমাদের মেরো না বাবা! মেরো না বাবা!

হাঃ হাঃ করে' হেসে উঠল ওরা! সে হাসি দুপুরের তপ্ত বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল একটা বিকট প্রতিধ্বনি নিয়ে। একবার নদীর দিকে চেয়ে দেখল তারা। স্রোত বয়ে চলেছে উদ্দাম গতিতে। আমাদের মৃতদেহ ভাসিয়ে দেবার অপূর্ব্ব সুযোগ। তা'রা আরও এগিয়ে এসে এবার তুলল তাদের রাম দা।

আমি ও আমার স্ত্রী প্রাণভয়ে হাতযোড় ক'রে কাকুতি মিনতি করতে

লাগলাম। ছেলে মেয়ে দু'টী আমাদের দু'জনকে জড়িয়ে ধরে' উচ্চৈস্বরে কাঁদতে লাগল।

আমার স্ত্রী কাঁদতে কাঁদতে বলল : আমাদের টাকাকড়ি গয়নাগাঁটি সব নাও বাবারা, শুধু আমাদের প্রাণে মেরো না, তোমাদের পায়ে পড়ি।

কে কা'র কথা শোনে! আমরা বেঁচে থাকলে ওদের ধরা পড়বার খুবই সম্ভাবনা—এটা ওরা ভালরকমই বুঝেছিল। সময় নষ্ট করতে চায় না ওরা। আমাদের এখনি প্রাণে মারবেই। রাম দা দু'টো উর্দ্ধে ঝক্ ঝক্ করে ঝল্‌সে উঠল। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে হঠাৎ হুড়মুড় শব্দ করে' ছুটে এসে কারা যেন আততায়ী দু'জনকে বিদ্যুৎবেগে উল্টে ফেলে দিলে। আমরা মহাতঙ্কে চিৎকার করে উঠলাম। রাম দা ওদের হাত থেকে ছিটকে পড়ল দূরে! ওরা মাটিতে পড়ে' দারুণ যন্ত্রণায় ভয়ানক আর্ত্তনাদ করতে লাগল।

মুহূর্ত্ত মধ্যে যেন এক অলৌকিক ব্যাপার ঘটে গেল। আমরা মোহাবিষ্টের মত ওদের দিকে চেয়ে রইলাম। এ কি ভীষণ কাণ্ড!

গাড়োয়ান ও তার সঙ্গী দুজনেরই পেটের মধ্যে শিংয়ের খোঁচা দিয়ে মাটিতে ফেলে দিয়েছে গাড়ীর গরু দু'টো। একেবারে রক্তারক্তি ব্যাপার! ঘাস খাওয়া ছেড়ে দিয়ে এ দিকে দেখছিল ওরা। গরুর জান্তব বুদ্ধি হয়ত বুঝেছিল আমাদের কাকুতি মিনতির বেদনা। অনুভব করেছিল আমাদের আসন্ন বিপদের আভাষ। পশুবুদ্ধির এইরকম অপরূপ বিদ্যুৎ-বিকাশ কত অঘটন ঘটিয়েছে বলে' বইয়ে পড়েছি, লোকের মুখে শুনেছি, আজ স্বচক্ষে দেখে ভগবানের দয়ার কথা ভেবে চোখে জল এল। মনে হোল' ওরা ত গরু নয়, ভগবানের করুণা নেমেছে ধরণীর ধূলিতে ওদেরই রূপ ধরে'। 'বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্'—এর সার্থকতা যে কোথায় তা' আজ মৃত্যুর দ্বারে দাঁড়িয়ে বুঝতে পারলাম।

গাড়োয়ান ও তার সঙ্গী মাটি ছেড়ে আর উঠতে পারে নি ; গরু দু'টীও ওদের বুকের ওপর শিং বেঁকিয়ে ওদের আগলে দাঁড়িয়েছিল। ঘটনাক্রমে একদল বরযাত্রী ও-পথ দিয়ে আস্‌ছিলেন, তাঁরা এই ভয়ানক ব্যাপারটা শুনলেন। আততায়ীর পেটে শিংয়ের আঘাত দেখলেন। গরু দু'টীই যে ঐ আঘাত করেছে তা'তে সন্দেহ রইল না তাঁদের। পুলিশে খবর গেল। তারপর অনেক কিছুই ঘটল।

সদরের হাসপাতালে পাঠিয়েও ওদের দু'জনকে বাঁচাতে পারল না পুলিশ। ভগবানই ওদের চরম শাস্তি দিলেন।

অনেক সুপারিশে অনেক কষ্টে অনেক টাকা খরচ করে' আমি ঐ গরু দুটীকে কিনে নিলাম। আজ আমার গোয়ালে যে দু'টী গরুর শিং রূপো দিয়ে বাঁধানো দেখেছেন ওরাই আমাদের জীবন-রক্ষক সেই গরু।

তারপর থেকে গো-জাতির প্রতি আমার শ্রদ্ধা অত্যন্ত বেড়ে উঠল। গরুসংক্রান্ত ব্যাপারে টাকা খরচ করতে আমি কোনদিনই পশ্চাৎপদ হই নি। আমার সঞ্চিত সমগ্র অর্থ গো-সেবায় নিয়োজিত করেছি। গো-জাতির কল্যাণে যেখানে যত সভা-সমিতি আছে আমি তার সভ্য ও পৃষ্ঠপোষক। নিজের হাতে গরুগুলিকে খাওয়াই, নিজের হাতে তাদের সেবা করি। গরুর ঋণ এ জীবনে শোধ করতে পারবো না।

ধেনুপদবাবু থামলেন। তারপর আমার দিকে চেয়ে একটু মিষ্টি হাসি হেসে অনুরোধ করলেন : আমার জীবনের এ কাহিনীটা কাগজে ছাপিয়ে দিতে পারেন? জগতের মঙ্গল হবে। অবশ্য গো-ব্রাহ্মণ-হিতায় চ, কি বলেন?

আমি ঘাড় নেড়ে সম্মতি প্রকাশ করলাম। ধেনুপদবাবুর মুখ প্রসন্ন হয়ে উঠল।

রবীন্দ্র-জয়ন্তী

শ্রীযতীন্দ্রনাথ বিশ্বাস

আজ পঁচিশে বৈশাখ—রবীন্দ্র-জয়ন্তী হবে তরুণ পাঠাগারে। পাঠাগারটি বেশ সাজানো হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের তৈলচিত্রখানি শোভিত হয়েছে পুষ্পমাল্যে। চেয়ার ভাড়া করে আনা হয়েছে অনেকগুলি। তা' ছাড়া খানকয়েক বেঞ্চও আছে। কর্ম্মসূচীর ব্যবস্থা হয়েছে ভালো। এসেছেন অনেক গণ্যমান্য লোক। উপস্থিত হয়েছেন কয়েকজন ভদ্রমহিলাও। তরুণদের উদ্যমের শেষ নেই। পাড়ার মধ্যে ঐ একটি পাঠাগার। পাঠাগারটি বেশ বড়। অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণের বস্তু ছিল কুমারী স্বপ্না সেনের নৃত্য। ব্যারিষ্টার এ, কে, সেনের মেয়ে স্বপ্না। স্বপ্নার বাপ মা বলেন, মেয়ে আধুনিক নৃত্য যা' শিখেছে অন্য মেয়ে তার পায়ের পাশে দাঁড়াতেই পারে না। এই নাচ দেখাবার জন্যে স্বপ্নার সাদর আহ্বান আসে—আসে নিমন্ত্রণ প্রায়ই। বিশেষ করে রবীন্দ্র-জয়ন্তীতে তো কথাই নেই। সকালে রাত্রে কবিপক্ষের প্রতিদিন কোথাও না কোথাও স্বপ্নার নৃত্যানুষ্ঠান আছেই। সাজগোজ করে' স্বপ্না যায় হাতে নিয়ে পায়ের ঝুমুর। তার চেয়ে বেশি সাজ করে' মেয়ের সঙ্গে চলেন ব্যারিষ্টার এ, কে, সেনের পরিবার শ্রীমতী সুনন্দা সেন। সভা-সমিতিতে স্বপ্নার নৃত্যকলার প্রশংসা সব চেয়ে বেশি করেন স্বপ্নার মা। তাঁর কথা সমর্থন করে' স্বপ্নার চেয়ে বেশি উৎসাহ দেয় শ্রীমতী সুনন্দা সেনকে স্বপ্নার তরুণ স্তাবকরা। পূর্ব্বে এমনি এক নৃত্যসভায় কে একজন নাকি জিজ্ঞেস করেছিলেন স্বপ্নার মাকে, স্বপ্না এমন নৃত্যকৌশল শিখলে কেমন করে। উত্তরে বলেছিলেন তিনি যে,

বাড়াতে রীতিমত মাইনে দিয়ে নাচের মাষ্টার রেখে স্বপ্নাকে নাচ শেখানো হয়েছে। তা' শুনে সেদিন প্রশ্নকারী সানন্দ বিস্ময়ে বলে' উঠেছিলেন, ও-ও—তাই নাকি!

এছাড়া রবীন্দ্র-সঙ্গীত ও আবৃত্তি অনেকগুলো হবেই।

শ্রীনটবর সরখেল আসছেন প্রধান অতিথি হয়ে। সরখেল মশাই সরকারী চাকরি করেন। পদ উচ্চ। মাহিনাও বেশ মোটা পান। সভা-সমিতিতে প্রধান অতিথি হয়ে যাওয়ার বাতিক তাঁর খুব আছে। পূর্ব্বে মেদিনীপুর জেলায় ছিলেন। বর্ত্তমানে কোলকাতায় তিনি বদলি হয়েছেন। পাঁচজনের সঙ্গে মিশতে তিনি ভালোবাসেন—চান্ জন-প্রিয়তা। সাহিত্যের তিনি ধার ধারেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা বড় উপাধি আছে—তারির জোরে শিক্ষিত বলে' পরিচিত তিনি। গৃহে সন্তানাদি নাই। তিনি আর তাঁর গৃহিণী—এই দু'জনকে নিয়েই তাঁর সংসার। পাড়ার পাঁচজনে গিয়ে সরখেল মশাইকে ধরলেন—পাঠাগারের রবীন্দ্র-জয়ন্তীতে তাঁকে প্রধান অতিথি হবার জন্যে। তাঁর বাসা নিকটেই—একরকম প্রতিবাসী বলতে গেলে। সকলের অনুরোধ তিনি আর প্রত্যাখ্যান করতে পারলেন না। স্বীকৃতি দিলেন প্রধান অতিথি হবার। পাঠাগারের কর্ম্মকর্ত্তাদের আশা—সরখেল মশাইকে হাত করতে পারলে পাঠাগারের উন্নতিকল্পে বেশ মোটা রকমের কিছু আর্থিক সাহায্য পাওয়া যাবে তাঁর নিকট থেকে।

সন্ধ্যার পর আসর বেশ জম্‌জমাট। বিশ্বকবির প্রতিকৃতির সম্মুখে একখানি রূপার রেকাবিতে সুগন্ধি পুষ্পসম্ভার সাজিয়ে রাখা হয়েছে। ছবি হলেও—কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের ঋষিকল্প সুন্দর মুখাবয়বের দিকে একটুখানি তাকিয়ে থাকলেই শ্রদ্ধায় মন আপনা হ'তে নত হয়ে পড়ে। তাঁর চোখের চাহনি বিরাট অন্তরেরই পরিচয় দেয়। ছবিখানির

দু'পাশে ধূপ জ্বলছে ধিকি-ধিকি। একটা বেশ সাবলীল মিষ্ট ভঙ্গিতে ধূপের ধোঁয়া উঠছে সূক্ষ্ম রেখায় কুণ্ডলী পাকিয়ে পাকিয়ে। যেন উপযুক্ত পরিবেশে একটা নাচের ছন্দ ধরে বাতাসে ভেসে ভেসে উঠছে দু'টি জ্বলন্ত ধূপের মুখ থেকে দু'টি কৃশ স্পর্শভঙ্গুর ফিকে ধোঁয়ার রেখা। কখনও রেখায় রেখায় জড়িয়ে যাচ্ছে—আবার মুহূর্তে ছিন্ন হচ্ছে উভয়ের মিলন। তবু চলছে যেন একটা ছন্দের গতি মধুর কাব্যের মত। সেটা বোঝা যায় বেশ অনুভূতি দিয়ে একটুখানি আবেশভরা চোখ মেলে তাকালেই। ভদ্র ভদ্রা এসেছেন অনেকে। উপস্থিত হয়েছেন সভাপতি মশাই ও প্রধান অতিথি। কিন্তু সভার কার্য্য আরম্ভ হতে পারছে না। তার কারণ কুমারী স্বপ্না সেন এখনও অনুপস্থিত। সকলেই বেশ উস্‌খুস্‌ করতে লাগল। একজন ফিস্‌ ফিস্‌ করে' আর একজনকে বললে, দেরি হবার তো কোন কারণ বুঝতে পারছি না। স্বপ্নার মায়ের হাতে ট্যাক্সি-ভাড়া পাঁচটাকা তো আজ সকালেই দিয়ে এসেছি। একবার সাইকেল নিয়ে দৌড়ে যাবো না কি ব্যারিষ্টার সেনের বাড়ীতে—

বাধা দিয়ে আর একজন বললে, না-না—এখন যাবার দরকার নেই। ট্যাক্সি-ভাড়া যখন নিয়েছেন তখন নিশ্চিত আসবেন। আর একটু অপেক্ষা করে' দেখ'।

অগত্যা পথের দিকে চেয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন সকলে।

—ট্যাক্সি-ভাড়া স্বপ্নার মা কি চেয়েছিলেন—না—

—তিনি ট্যাক্সি-ভাড়া আগেই চেয়ে নেন। ট্যাক্সি-ভাড়া না দিয়ে এলে তিনি স্বপ্নাকে নাচ দেখাতে কোথাও পাঠান না। তবে রবীন্দ্রনাথের ভক্ত বলে' এ ব্যাপারে ট্যাক্সি-ভাড়া কম নিয়েছেন, নইলে আরও বেশি নিতেন। ভাড়া না দিয়ে এলে আসবেন কেন—দায় পড়েছে—ওঁদের তো একটা সম্মান আছে।

—তা বটে।

—ট্যাক্সি-ভাড়া না দিয়ে আমরা যদি ঠিক সময়ে গাড়ী নিয়ে যেতুম।

—তাতে ওঁরা আসেন না। অন্য আর এক জায়গায় সভা সেরে তারপর আসবেন—গাড়ী নিয়ে যেতে প্রত্যেককেই বারণ করেন।

—তা বটে।

কথা হচ্ছিল কর্ম্মকর্ত্তাদের মধ্যে। ঠিক এমন সময় শ্রীমতী সুনন্দা সেন হাতে বটুয়া ঢঙের একটা ভ্যানিটি ব্যাগ ঝুলিয়ে স্বপ্নাকে সঙ্গে নিয়ে পথের মোড়ে সহসা আবির্ভূতা হলেন। একটু হন্তদন্ত হয়ে আসছেন তাড়াতাড়ি। বুঝতে পেরেছেন—তাঁদের জন্যে অপেক্ষা করছেন সকলে।

একজন বলে উঠল, ঐ ওঁরা আসছেন।

আসছেন—আসছেন—কথাটায় বেশ একটা মৃদু শিহরণ খেলে গেল আসরের মধ্যে।

—কৈ হে—ট্যাক্সি করে' আসবেন যে বলেছিলেন।

উত্তর এল না কোন।

শ্রীমতী সুনন্দা সেন সকন্যা এসে উপস্থিত হলেন। কর্ম্মকর্ত্তাদের নিকট দাঁড়িয়ে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। চলে আসতে পায়ে হেঁটে মুখ রাঙা হয়ে উঠেছে। বিন্দু বিন্দু গালের ঘাম হাতের রুমাল দিয়ে আল্‌তো আল্‌তো চাপে মুছতে মুছতে মৃদু হেসে বলে উঠলেন, কী বিভ্রাট—কী বিভ্রাট! ঐ মোড়ের মাথায় ট্যাক্সিখানা খারাপ হয়ে গেল—আর চলতে চায় না। ঐখানেই শেষে তার ভাড়া মিটিয়ে চলে এলুম।

—বেশ করেছেন! বেশ করেছেন! আসুন—আসুন—ভেতরে আসুন

সভার কার্য্য আরম্ভ হল' এইবার। কর্ম্মসূচীর কোন অঙ্গের ত্রুটি হল' না। স্বপ্না সেনের কেশবেশের বিন্যাসটা একটু ওরির মধ্যে মেরামত করে দিতে লাগলেন শ্রীমতী সুনন্দা। স্বপ্না সেন তার অর্জ্জিত কলাবিদ্যাটা দেখালে। আধুনিকতার মুখোশ-পরা অনেকটা থিয়েটারী নাচ। বাহবা দিলে হাততালি দিয়ে অনেকে। প্রশংসা করলেন শ্রীমতী সুনন্দা সেন। স্বপ্নার মেদবহুল চেহারা। একেবারে সর্ব্বাঙ্গে ঘেমে ভিজে উঠল স্বপ্না। নৃত্যছন্দে যতি পড়লে স্বপ্না হাঁপাতে লাগল। একটি ছোকরা তাড়াতাড়ি টেবিল-ফ্যানটা ঘুরিয়ে দিলে। শ্রীমতী সুনন্দা স্বপ্নাকে পাশে বসিয়ে তার এলিয়ে-পড়া দুরন্ত কবরীগুচ্ছের শাসনকার্য্যে রত হলেন। ওদিকে সভার কার্য্য চলতে লাগল কর্ম্মসূচী-অনুযায়ী।

এইবার প্রধান অতিথির ভাষণ হবে। সরখেল মশাই একটু বক্তৃতা দেবেন। সকলে মনোযোগী হলেন। সরখেল মশাই লিখে এনেছেন তাঁর ভাষণটি। তাঁর এক সাহিত্যরসিক বন্ধু তাঁকে এ কার্য্যে সাহায্য করেছেন পূর্ব্বরাত্রে। ভাষণটি বেশ মনোজ্ঞ হল'। রবীন্দ্রনাথ যে আমাদের কী ছিলেন এবং কতখানি ছিলেন—এই কথাই তিনি বলতে লাগলেন বারবার। তাঁর স্মৃতি আমরা যেন না ভুলি। ঘরে ঘরে যেন তাঁর আসনখানি রাখি পেতে। তিনি আমাদের পূজা চাননি, চেয়েছেন আমাদের ভালোবাসা। আমরা সেই ভালোবাসায় যেন খাদ না মেশাই। তাঁর কাব্যের আস্বাদ যেন আমরা প্রত্যেকেই গ্রহণ করি নিত্য নব নব রূপে। রবীন্দ্রনাথের মনীষা যেন আমাদের সদা-সর্ব্বদা ঘিরে রাখে। আমরা যেন তাইতে উদ্বুদ্ধ হই—পাই যেন তা' থেকে চেতনা। তাঁর বিরাট মনের এক কণাও যেন আমরা হৃদয়ঙ্গম করতে পারি তাঁর অনবদ্য বাণী থেকে। এই ব্রতই যেন আমরা প্রতিনিয়ত নিয়ে চলি আমাদের জীবনপথের পাথেয় করে'।

ইত্যাদি ইত্যাদি। সবশেষে কবিকে উদ্দেশ করে' সরখেল মশাই তাঁর অন্তরের শ্রদ্ধা জানালেন 'ভুলি নাই—ভুলি নাই' প্রিয়া বলে'।

সরখেল মশা'য়ের ভাষণ শেষ হ'লে উপস্থিত সকলে আনন্দে করতালি দিয়ে উঠল। যোগ্য লোককে প্রধান অতিথি পদে বরণ করা হয়েছে বলে' অনেকে মনে মনে গর্ব্ববোধ করলেন।

তারপর তরুণ পাঠাগারের সভা শেষ হল' বটে, কিন্তু রবীন্দ্র-জয়ন্তী তখনও শেষ হয় নি।

স্বপ্নাকে নিয়ে শ্রীমতী সুনন্দা সেন মিহি সুরে বিদায় নিলেন করপুটে নমস্কার নিবেদন করে'। জানিয়ে গেলেন—বাঁচেন যদি এবং কবি যদি দয়া রাখেন তা'হলে আবার সামনে বছর এমন দিনে পুনরায় আসবেন।

ট্যাক্সি-ভাড়া যাবার সময় দিতে হয় নি। যাতায়াতের জন্য একেবারে পাঁচটাকা পূর্ব্বেই শ্রীমতী সুনন্দা সেন নিয়ে রেখেছিলেন।

একজন জিজ্ঞেস করলেন, ট্যাক্সি একখানা ডেকে আনি?

শ্রীমতী সুনন্দা বললেন ডান হাতখানা ছন্দে ছন্দে নাড়তে নাড়তে, না—না—আপনাদের আর কষ্ট করতে হবে না। আমি ঐ মোড় থেকে একখানা ট্যাক্সি ডেকে নেব'খন। নমস্কার।

বিদায় নিলেন অতঃপর সকন্যা সুনন্দা সেন। এগিয়ে চলেছেন তাঁরা—মা ও মেয়ে—রবীন্দ্র-জয়ন্তী সেরে। দু'টি দেহবল্লরী দুলছে যেন চলার ছন্দে—আর তারির সঙ্গে সঙ্গে দুলছে এদিক ওদিক ঘুরে ঘুরে শ্রীমতী সুনন্দা সেনের হাতের ভ্যানিটি ব্যাগটা—বটুয়া ঢঙের ভ্যানিটি ব্যাগটা।

সরখেল মশাই বাড়ী আসতেই সরখেল গৃহিণী বললেন, হ'লো সারা তোমার কাজ—বাব্বাঃ! ঐ নীলুকে আসতে বলেছিলে—সে সন্ধ্যার পর থেকে এসে বসে আছে ঘরে।

'ও—ও'—বলে' সরখেল মশাই এগুলেন সেই ঘরের দিকে।

সরখেল মশাই বাজে জিনিষপত্র ঘরে রাখেন না। অর্থ সঞ্চয়ের দিকে তাঁর ও তাঁর গৃহিণীর লক্ষ্য খুব। ভাঙা কাঁচগুলো পর্য্যন্ত একটা খালি তেলের টিনের মধ্যে ফেলে রাখেন। সময় হ'লে সেগুলো যা' হোক চার ছ'পয়সায় বেচে দেন। মেদিনীপুর থেকে আসবার সময় তিনি বাক্সে বই কতকগুলো একত্র করে' বয়ে এনেছিলেন কোলকাতায় এসে বেচবেন বলে'। অনেকগুলো বই তাঁর বিবাহের সময় তাঁর স্ত্রীর হাতে উপহার দিয়েছিলেন তাঁর বন্ধুরা। সেই বইগুলো এখনও বেশ ভালো অবস্থায়ই আছে—ব্যবহার মোটেই হয় নি। আর আছে তাঁর ছাত্র-জীবনের কয়েকখানি পাঠ্যপুস্তক। নীলুর দোকান আছে পুরনো বই খরিদ ও বিক্রি করার। সরখেল মশাই একদিন এর পূর্ব্বে তার দোকানে গিয়ে নিজের বাসার ঠিকানাটা দিয়ে এসেছিলেন। সেই নীলু এসেছে আজ।

সরখেল মশাই বইয়ের বাণ্ডিলটা নিয়ে এলেন নীলুর সাম্নে। নীলু এক এক করে বইগুলো বার করতে লাগল। সরখেল মশাই আর কাপড় জামা না ছেড়েই একটা কাগজে লিষ্ট্ করতে বসে গেলেন পুরনো বইগুলোর।

বললেন, বই সব ভালোই আছে, নীলু। তুমি দেখে নিও—বেশী দামেই বেচতে পারবে।

লিষ্ট্ লিখতে লাগলেন সরখেল মশাই—

১। Burke's speech on American Taxation, ২। অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্, ৩। গীতাঞ্জলি, ৪। চয়নিকা, ৫। Palgrave's Golden Treasury. Book IV, ৬। যোগাযোগ, ৭। বিপ্রদাস, ৮। Othello, ৯। গোরা, ১০। গীত-বিতান।

এমন সময় সরখেল গৃহিণী দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বললেন, ও সব আবর্জ্জনা আর ঘরে রেখ' না। যা' দাম হয় নীলুর কাছ থেকে নিয়ে ওকে বেচে দাও, বুঝলে!

সরখেল মশাই বললেন, হ্যাঁ গো! এ জঞ্জাল আজ বিদেয় করব বলেই তো—হ্যাঁ—তারপর নীলু ওখানা কি বই? দশখানা হয়ে গেছে—

লিষ্ট্ লিখতে পুনরায় মন দিলেন সরখেল মশাই—

১১। Merchant of Venice, ১২। মহুয়া, ১৩। উদ্‌ভ্রান্ত-প্রেম, ১৪। বলাকা, ১৫। সোনার তরী।

থাক্—লিষ্ট্ বড়ই হবে। আর ভালো লাগছে না। রবীন্দ্র-জয়ন্তী এইখানেই শেষ হোক্।

—"সাধারণতঃ সভ্যসমাজে প্রচলিত যতগুলি ধর্ম্মপথ আছে তাহাদের পশ্চাতে ততগুলি ধর্ম্মমত আছে। কিন্তু একটু বিচার করিলেই দেখিতে পাইব যে, ধর্ম্মের পথগুলিই জাগিয়াছে আগে, মতগুলি আসিয়াছে সেই পথ ধরিয়া। ঐ মতগুলিকে অবলম্বন করিয়াই যে পথগুলি জাগিয়া উঠিয়াছিল এই প্রচলিত ধারণাটাই অনেকখানি ভুল, বরঞ্চ তাহার উল্টা কথাটাই অধিক সত্য।" —রবীন্দ্রনাথ

চরিত্র, স্বাস্থ্য ও শক্তি

স্বাস্থ্যের প্রথম কথা হলো ব্রহ্মচর্য। ব্রহ্মচর্য চাই-ই চাই। ব্রহ্মচর্যেই হয় মহাশক্তির বিকাশ। উপনিষদের ঋষিদের মতো ঈশ্বরের কাছে আমাদেরও প্রার্থনা করতে হবে—'ওজো দেহি মে, বীর্যং দেহি মে, তেজো দেহি মে।' যে নির্বীর্য সে পৃথিবীর ভার-স্বরূপ—তার দ্বারা জগতের কোনো কল্যাণই হবে না।

এই তেজ দেখতে পাই মহাভারতের প্রতিটি চরিত্রে। ভীষ্মদেব পিতার তৃপ্ত্যর্থে সারা জীবন বিবাহ করলেন না এবং বিশাল সাম্রাজ্য ও তার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য অনায়াসে ত্যাগ করলেন।

এই ত্যাগ এবং সংযম না হলে মানুষের চরিত্র গঠিত হয় না, এই সংযমের মধ্যেই আছে পূর্ণ মানবতা।

সুস্থদেহ লাভ করতে হলে সাধনার দরকার। সে সাধনা নিয়মিত ব্যায়ামে নেই, আছে জীবন-যাত্রার সংযমে। সৃষ্টিতত্ত্বের মূলেও রয়েছে এই সংযম।

এই একই নিয়মে সূর্য্য উঠছে, অস্ত যাচ্ছে—একই নিয়মে দিন ও রাত্রি হচ্ছে, ঋতুর পর ঋতু বদলে যাচ্ছে। নিয়মে বাঁধা জীবন ও মৃত্যু। এই নিয়মের ব্যতিক্রম হলেই ধ্বংস।

জীবনকেও নিয়মে বাঁধতে হবে। এই নিয়মে-বাঁধার নামই সংযম।

রবীন্দ্রনাথের জীবনে দেখেছি আমরা এই সংযম। এই সংযমই তাঁকে মহৎ থেকে মহীয়ান করে তুলেছে। জগতে যাঁরাই নাম করে গিয়েছেন, তাঁদের প্রতিষ্ঠিত জীবনের মূলে আছে এই সংযম।

আয়ুর্বেদের ঋষি বলেছেন, মিথ্যা আহার বিহারই অসুস্থতার কারণ।

খেলেই শরীর ভাল হয় না। আহারের মধ্যেও চাই এই সংযম। একমাত্র পরিমিত আহার এবং পরিমিত বিহারই শরীরকে সুস্থ রাখতে পারে। পুষ্টিকর খাদ্যের প্রয়োজন আছে সত্যি, কিন্তু তার চাইতেও বেশী প্রয়োজন নিয়মিত ও পরিমিত আহারের।

আহারের কথা এখন থাক। আমাদের পরিবেশকে গড়ে তুলতে হবে—নইলে বাইরের সহস্র উপকরণ এনে জড়ো করলেও স্বাস্থ্য অর্জন করা যাবে না।

সেদিন পণ্ডিত জওহরলাল বললেন, আমাদের এমন সমাজ গড়ে তুলতে হবে, যে-সমাজ থেকে সুস্থ শিক্ষিত চরিত্রবান মানুষ জন্মলাভ করবে।

কিন্তু এই সমাজকে গড়ে তুলতে হলে আমাদের প্রাচীন ভারতের আদর্শকে গ্রহণ করতে হবে। প্রাচীন ভারতের আদর্শ ছিলো গুরুগৃহে বাস। তখন এই গুরুগৃহ থেকেই ছেলেদের চরিত্র গড়ে উঠতো। গুরুর নিয়ত সান্নিধ্যে তাঁর প্রভাবই সংক্রামিত হতো শিষ্যের মধ্যে। পরিবেশও ছিলো আশ্রমোচিত পবিত্র।

উপযুক্ত গুরুর যোগ্য প্রতিনিধি হয়ে তারা যখন ঘরে ফিরে আসতো—রূপে-গুণে-চরিত্রে-স্বাস্থ্যে একটি পূর্ণ মানব।

এই গুরুগৃহে তাদের কেবল শাস্ত্র-শিক্ষাই দেওয়া হতো না। তারা শিখতো, ব্রহ্মচর্য-পালনের বিধি-নিষেধ, শস্ত্র-শিক্ষার বিবিধ কৌশল। একটি সর্বতোমুখী প্রতিভার পাশে বসে পাঠ-গ্রহণ।

কিন্তু সকল শিক্ষার প্রথম পাঠই ছিলো তখন স্বাস্থ্যরক্ষা। কারণ স্বাস্থ্য না থাকলে তার সকল পরিশ্রমই হতো বৃথা।

এ আদর্শ নেই আমাদের বর্তমান শিক্ষার মধ্যে। এ শিক্ষা

আমাদের বর্জন করতে হবে। জওহরলাল বলেছেন, নতুন শিক্ষা-ধারার প্রবর্তন করতে হবে। যে-শিক্ষা—আমাদের উদ্যোগী পুরুষ সিংহ হতে সহায়তা করবে। পরিশ্রমকে ভয় করলে চলবে না। ঐ পরিশ্রমের মধ্যেই আছে সত্যিকার প্রাণ-শক্তি। যে-শক্তি মানুষকে হেয় জ্ঞান করে না, উচ্চনীচের ভেদ রাখে না।

ঐ মুটে-মজুরের মতোই আমাদের শারীরিক পরিশ্রম ক'রে জীবিকা সংগ্রহ করতে হবে। কে বলেছে ওরা স্বতন্ত্র? তোমার খাবার তুমিই সংগ্রহ করবে। স্বাস্থ্য আছে ঐখানে—খাটো, খাও। গান্ধীজী এই আদর্শেই বুনিয়াদী শিক্ষার প্রবর্তন করে গিয়েছেন।

ব্যায়াম করলেই দেহ গঠিত হয় না—চাই ঐ সঙ্গে ব্রহ্মচর্য। এই ব্রহ্মচর্যের দ্বারাই মনের বিকাশ হয়। যে মনের সঙ্গে আছে দেহের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ। মনকে ভাল রাখতে হবে, তবেই দেহ ভাল থাকবে—আবার দেহ ভাল না থাকলে মনও ভাল থাকে না।

ব্রহ্মচর্য কি, আমাদের জাতীয় জীবনে, আমাদের জাতীয় চরিত্রে তার কতখানি প্রয়োজন সেকথা আজ আমরা ভুলে গিয়েছি বলেই আজ এতবড় একটা জাতের এই অধঃপতন। আজ বাংলার তরুণ-তরুণীদের খুঁজে বের করে নিতে হবে সেই ব্রহ্মচর্যের কি আদর্শ, কি তার বিধিনিষেধ, কি তার রীতি-নীতি। এই রীতি-নীতির মধ্যেই আছে সত্যিকারের জীবন-ধারণের পরমানন্দ, আছে সঞ্জীবন মন্ত্র—যে মন্ত্রে বিধৃত হয়ে আছে মানুষের সমগ্র ঐতিহাসিক অস্তিত্ব।

একথা সত্যি, খাদ্যের মধ্যে আছে প্রাণ-শক্তি। কিন্তু খাদ্য কোথায়? আজ ভাল ঘি-দুধ পয়সা দিয়েও পাওয়া যায় না। তেলের মধ্যেও ভেজাল। অর্থলোভে জাতীয় চরিত্র আজ এত নীচে নেমে গিয়েছে যে মানুষের খাদ্যে বিষ মেশাতেও সে কুণ্ঠিত নয়।

আজ দেশে খাদ্য নেই, মানুষ বাঁচবে কিসের জোরে? মানুষ আজ আর মানুষ নয়, জল্লাদ! পরস্পরের অলক্ষ্যে সে ছুরি শানাচ্ছে।

আজ সমাজকে সেই দায়িত্বই নিতে হবে—যা একদিন বিবেকানন্দ নিয়েছিলেন, মানুষ-গড়ার কাজ।

রোগ-বিচার করে ওষুধের ব্যবস্থা করতে হবে। আজ ব্যাধি সর্বত্র। কোথা থেকে কাজ সুরু হবে সেই জটিল-গ্রন্থিই আমাদের খুঁজে বের করতে হবে। আজ মানুষের মনন-শক্তিতেই শুধু নয়, তার মনন-কেন্দ্রে ধরেছে ভাঙন। তার চরিত্রে ধরেছে ঘুণ।

আজ যারা শিশু, যারা কিশোর-কিশোরী, যারা তরুণ, আজো যারা রয়েছে কাঁচা—আজ জাতির সমগ্র শক্তি ও দৃষ্টি দিয়ে তাদের গ'ড়ে তুলতে হবে, যাতে তারা আগামী যুগের যোগ্য মানুষ বলে পরিচিত হতে পারে। তাদের জন্যে চাই নতুন বিদ্যালয়, নতুন শিক্ষা-পদ্ধতি, নতুন পাঠ্য-পুস্তক এবং নতুন শিক্ষক, নতুন পরিবেশ। যাঁরা তাদের কতকগুলো বই-এর পড়াই পড়াবেন না—তাদের স্বাস্থ্যের সঙ্গে চরিত্র গ'ড়ে তুলবেন।

স্বাধীন ভারতে আজ প্রথম এবং প্রধান কর্তব্যই হবে, এমনি একটি আদর্শ জাতিকে গ'ড়ে তোলা।

—"ছুঁচে সুতা পরাবে তো সরু কর। ফেঁসো ছিঁড়ে ফেল। মনকে ঈশ্বরে মগ্ন করাবে তো বাসনা ছেড়ে দীন হীন অকিঞ্চন হও।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

মাউ মাউদের কথা

শ্রীরামনাথ বিশ্বাস

ভারত মহাসাগরের পশ্চিম তীরে আফ্রিকা অবস্থিত। আফ্রিকা মহাদেশের পূর্বপ্রান্তে যে সকল দেশ আছে কেনিয়া দেশ তারই একটি। কেনিয়ার উত্তরে ইথোফিয়া এবং সুমালীদের দেশ। পূর্বে ভারত মহাসাগর, দক্ষিণে টাঙ্গানায়িকা এবং পশ্চিমে উগাণ্ডা।

কেনিয়ার ইতিহাস অতি সাধারণ। আরব, গ্রীক এবং পর্তুগীজদের লুণ্ঠন ক্ষেত্র বললেই চলে। কেনিয়াতে অনেক উপজাতির বাস, তাদের মধ্যে কিকুই উপজাতি আগাগোড়া বিদেশীদের সংগে লড়াই করে নিজের দেশের স্বাধীনতা বজায় রেখেছিল। অবশেষে যখন পর্তুগীজরা অন্যান্য নিগ্রো এবং আরবদের সঙ্গে গোলাম করতে আরম্ভ করল তখন আরবগণ ভীত হয়ে বৃটিশের স্মরণাপন্ন হয় এবং বৃটিশের কাছে মোম্বাসা বন্দর অর্পণ করে। মোম্বাসা বন্দরই কেনিয়া দেশের একমাত্র বন্দর বলা যেতে পারে। বর্তমানে এই বন্দরের সমূহ উন্নতি হয়েছে। সমুদ্রগামী বড় বড় জাহাজ এখানে আসে এবং যাত্রী নিয়ে ইউরোপ যায়।

কেনিয়া দেশটাকে দুইভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। পূর্ব দিকে নিম্নভূমি এবং পশ্চিম দিকে উচ্চভূমি। নিম্নভূমিতে বহু রকমের বন্য জীব রয়েছে, তাদের মধ্যে হিংস্র জীবের সংখ্যাও কম নয়, উপরন্তু রয়েছে ম্যালেরিয়া, কালা-আজর এবং টাইফয়েড। কলেরার নামগন্ধও নাই।

উচ্চভূমির আবহাওয়া শিলংএর আবহাওয়ার চেয়েও ভাল। কোনও-রূপ রোগের নামগন্ধও নাই। হিংস্র জীব শীতের মধ্যে আছে বটে কিন্তু তাদের সংখ্যা অতীব কম। সাধারণ লোক বিনা অস্ত্রেই চলাফেরা করতে পারে। কিকুউ উপজাতি পূর্বে উচ্চভূমিতেই বাস করত এবং যখনই কোনও বিদেশী তাদের দেশ আক্রমণ করত তখন কিকুউরাই আক্রমণকারীর সংগে সম্মুখ সমরে অগ্রসর হত। অন্যান্য উপজাতি জঙ্গলে লুকিয়ে থাকত।

বৃটিশ সরকার কেনিয়া দখল করার পর কিকুউদের কৌশলে উচ্চভূমি হতে নিম্নভূমিতে বিতাড়ণ করেছিল এবং উচ্চভূমি গোরা সেপাইদের থাকবার জন্য রিজার্ভ করেছিল। রিজার্ভ করা জায়গা আবাদ করার জন্য যে সামান্য মজুরের দরকার হয় সেই পরিমাণের কিকুউ বর্তমানে উচ্চভূমিতে দেখতে পাওয়া যায়।

কিকুউদের নিজেদের ভাষার নামও কিকুউ, কিন্তু তারা সোহেলী ভাষা নামে এক মিশ্রভাষা আয়ত্ব করত এবং এখনও সেই ভাষাতেই অন্যান্য উপজাতির সংগে বাক্যালাপ করে।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকেই কিকুউদের মধ্যে নবচেতনা জেগে উঠে। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় কিকুউরা বৃটিশ সরকারকে সাহায্য করে কুলির কাজ ক'রে। তারপর যখন ইটালী-আবিসিনিয়া যুদ্ধ আরম্ভ হয় তখন অনেক কিকুউ ইটালীয়ান্-সৈন্যের সংগে গরিলা যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে অনেক ইটালীয়ান্‌কে হত্যা করেছিল।

বৃটিশ সরকার কেনিয়াতে ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন করেছিল। শিক্ষার ভার ন্যস্ত হয়েছিল মিশনারীদের উপর। মিশনারীরা ইতিহাস এবং ভূগোল শিখাত না উপরন্তু যে পরিমাণে ছাত্র বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে চাইত তার সহস্রাংশের এক অংশও গ্রহণ করত না। এতে কেনিয়ার

যুব-সমাজের বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। কেনিয়ার যুব-সমাজ জোহেন্সবার্গের যুব-সমাজের স্মরণাপন্ন হয় এবং দক্ষিণ আফ্রিকার যুব-সমাজ কেনিয়ার যুব-সমাজের শিক্ষার ভার নেবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। এতে ব্যাপার গুরুতর হয়।

আমাদের দেশের শিক্ষক মহাশয়েরা ঘরে বসে ছেলেমেয়ের লেখা পড়া শিখিয়ে থাকেন। সর্বসাধারণ তাঁদের প্রত্যেককে সম্মান করে, নিমন্ত্রণ করে ভোজন করায়, এতেও আমাদের শিক্ষক মহাশয়েরা বলেন, বড়ই খাটুনি, কিন্তু কেনিয়াতে শিক্ষকতা করা আর যমের সঙ্গে প্রত্যেক মিনিট যুদ্ধ করা একই কথা।

কেনিয়ার যুব-সমাজের আমন্ত্রণ পেয়ে অনেক দক্ষিণ আফ্রিকান্ যুবক শিক্ষক রূপে কেনিয়াতে ছদ্মবেশে প্রবেশ করেন। এঁদের পরিচয় নিম্নে সংক্ষেপে দেওয়া গেল। সর্বপ্রথমই হলেন বান্তু শিক্ষক শ্রেণী। শরীরের গঠনে, বর্ণে এবং চালচলনে কিকুউদের মতই। শিক্ষায় কিন্তু আমাদের দেশের যে কোনও শিক্ষিত লোকের সমকক্ষ। তারপরই হলেন স্কোলী বয়, দেখতে ইউরোপীয়ানের মত, শিক্ষার দিক দিয়ে তেমন উন্নত নন্ তবে প্রত্যেকেই এক একটি প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকণার চেয়েও বড়। তৃতীয় পর্য্যায়ে হলেন ভারতীয় ব্যবসায়ীদের পুত্র কন্যা যাঁরা নিগ্রাণীর গর্ভে জন্ম নিয়েও স্বদেশে এবং বিদেশে শিক্ষা পেয়েছিলেন।

কেনিয়াতে একটি আইন আছে, সেই আইন মতে কেনিয়ার নেটিভদের বৃটিশ মিশনারী ছাড়া আর কেউ শিক্ষা দিতে পারবে না। ছাত্র সমাজ সেই আইন ভঙ্গ করে। গ্রামে গ্রামে শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন হয় এবং তিন সিপ্টে ছেলে বুড়ো সবাইকে সহেলী এবং ইংলিশ শিক্ষা দিতে আরম্ভ করে। ব্যাপার দেখে মিশনারীরা কেঁপে উঠে এবং

বৃটিশ সরকারকে এই বিষয়ে এতলা দিয়ে নিদ্রিত সিংহের ঘুম না ভাঙ্গাবার বন্দোবস্ত করতে অনুরোধ করে।

বৃটিশ সরকার বড়ই চতুর। কাজ ধীরে ধীরে করার নিয়ম তাদের মধ্যে প্রচলিত। সর্বপ্রথম বেআইনী মতে যাঁরা শিক্ষা দিতেন তাঁদের সাবধান করে বলে দেওয়া হয়, "এদিকে এস না, নিজ নিজ দেশে চলে যাও।"

আদেশ বৃথা হল, নবাগত শিক্ষকেরা পূর্বের মতই শিক্ষা দিতে ছিলেন। ব্যাপার গুরুতর দেখে শিক্ষকদের শাস্তি দেওয়া আরম্ভ হয়। জেলের ভেতর নির্য্যাতন আরম্ভ হবার পূর্বে শিক্ষকদের কমিউনিষ্ট আখ্যা দেওয়া হয় তারপর যা শুনেছি, সবই প্রমাণ সাপেক্ষ, তবে শোনা কথা বলতে বোধ হয় আপত্তি নাই।

একজন শিক্ষক বলেছিলেন তাদেরই একজনকে মোটর চাপা দিয়ে হত্যা করা হয়েছিল। এরূপ ঘটনা অন্তত আমি বিশ্বাস করেছিলাম কারণ আমার ভ্রমণ সময়ে মালয়দেশে একজন অস্ট্রেলিয়ান্ আমাকে মোটর চাপা দিয়ে হত্যা করতে চেষ্টা করেছিল।

সরকারী অত্যাচার চরমে উঠবার পর গোপনে শিক্ষাকার্য্য চলতে থাকে। বৃটিশ সরকার বুঝতে পারল প্রত্যেক গ্রামে যদি নিজের পেটোয়া লোক গ্রাম্য মণ্ডলরূপে না রাখা যায় তবে গ্রামের সংবাদ পাওয়া যাবে না। সেজন্য পুরাতন গ্রাম্য মণ্ডলদের সরিয়ে দিয়ে নূতন গ্রাম্য মণ্ডল নিয়োগ আরম্ভ হয়। গ্রাম্য মণ্ডলেরা কেনিয়ার বৃটিশ সরকারের আদেশ মত শিক্ষকদের ধরিয়ে দিতে থাকে। "সরকার বাহাদুর" সেই শিক্ষক মহাশয়দের জেলে পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারে নি, বেত মারাও ব্যবস্থা করে।

দেখতে দেখতে গ্রাম্য বিদ্যালয় উঠে গেল। বৃটিশ সরকার ও মিশনারীরা

মনে করল আপদ চুকে গেছে। কিন্তু আপদ চুকে গেল না, যে সকল গ্রাম্য শিক্ষক জেলে না গিয়ে আত্মগোপন করেছিল তারাই আবার নূতনরূপে বিভিন্ন গ্রামে দেখা দিল। বৃটিশ সরকার ধারণাও করতে পারেনি চর্ম-পরিহিত অর্দ্ধ উলঙ্গ অথবা অসভ্য রূপে শিক্ষকেরা পেটোয়া গ্রাম্য মণ্ডলের আদেশ অমান্য করে তার শাস্তির ব্যবস্থা করবে। গ্রাম্য শিক্ষকেরা অনুপাতে শাস্তির ব্যবস্থা করতে থাকে। যদি কেউকে সন্দেহ করে গ্রেপ্তার অথবা জেলে নিয়ে গুলি করা হ'ত, তবে গ্রাম্য শিক্ষকেরাও গ্রাম্য মণ্ডলকে হত্যা করত। অবস্থা যখন এই পর্য্যায়ে আসে তখনই কেনিয়ার বৃটিশ সরকার ইমারজেন্সী ঘোষণা করে, কিকুউরাও নিজেদের গোপন স্থান হতে বের হয়ে এসে মাউ মাউ রূপে নিজেদের পরিচয় দেয়।

পরবর্তী বিষয় বিপ্লবাত্মক বিষয়ের উপর ভিত্তি করে কয়েকটি গল্প মাত্র। গল্পগুলিও রয়টারের সংবাদের উপর ভিত্তি করেই লিখিত। এরূপ গল্প লেখার অধিকার আমার বোধ হয় আছে, কারণ কেনিয়া দেশটা আগাগোড়া আমি ভ্রমণ করেছি এবং ভ্রমণের সময় নিগ্রোদের সংগেই থেকেছি এবং তাদের অন্তরের ব্যাথা কোথায় বুঝতেও পেরেছি।

এম্‌বু একটি ছোট্ট ব্যবসায় কেন্দ্র। কয়েকজন ভারতবাসী সেখানে থাকে এবং ব্যবসা করে। ব্যবসা সীমাবদ্ধ। নিগ্রোদের নিত্য নৈমিত্তিক দরকারী জিনিস বেচাকেনা হয়। ভারতবাসীর সংখ্যা নগণ্য হলেও আদান প্রদানের দিক দিয়ে ত্রুটী দেখা যায় না, উপরন্তু ভারতীয় ব্যবসায়ীরা কিকুউদের সংগে বেশ ভাল ব্যবহার করে। বর্তমানে ব্যবসা খুবই কম, কারণ কিকুউরা বিপ্লব আরম্ভ করে দেওয়াতে অনেক গ্রাম জনশূন্য হয়েছে।

এম্‌বুর কাছেই নিগ্রোদের রিজার্ভ। রিজার্ভ এলাকায় অনেকগুলি

গ্রাম। গ্রামের নাম থাকে না। নম্বর দিয়ে গ্রামের নাম হয়। আমরা যে গ্রামের কথা এখন বলব সেই গ্রামের নম্বর হলো সাত নম্বর। এম্‌বু হতে সাত নম্বর গ্রাম আনুমাণিক আট দশ মাইল হবে। এই গ্রামের লোক সংখ্যা খুবই কম, মাত্র তিনটি পরিবার নিয়ে লোক সংখ্যা সীমাবদ্ধ। গ্রামের চারিদিকে চাম্বে নামক বৃক্ষের সমাবেশ। গাছগুলি আট দশ হাতের বেশী লম্বা হয় না, কিন্তু এর এতই শাখা বের হয় যে একটা গাছই বড় একটা ঝোপের স্থষ্টি করে। ঝোপের মধ্যে দিবালোক প্রবেশ করতে পারে না। বীজ হতে বের হয়েই বাড়তে থাকে এবং কয়েক বৎসরের মধ্যে আট দশ হাত লম্বা হয়ে পরে ডালপালা বৃদ্ধি করে ঝোপে পরিণত হয়।

গ্রামে যারা সক্ষম ছিল সকলেই চলে গেছে। কোথায় চলে গেছে এবং কেন গেছে বলবার দরকার মনে করে নি, শুধু ইয়াসী নামক একটি যুবতীকে যাবার দিন তিনটি শিশু আর একটি কিশোরের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য রেখে গিয়েছিল। গ্রামে পঁচানব্বই বৎসরের এক বৃদ্ধ ছিল, সে সবই জানত কিন্তু ইয়াসীকে কিছুই বলত না। ইয়াসী জিজ্ঞাসা করলে বলত, "সবাই কাজে গেছে, অনেক পাউণ্ড শিলিং নিয়ে আসবে বুঝলে ইয়াসী! বৃদ্ধের কথার প্রত্যুত্তর করা যুক্তিযুক্ত হবে না মনে করে ইয়াসী চুপ করে থাকত।

তারু কিশোর, খেলাধূলা করেই সময় কাটায়, শুধু খাবার সময় ইয়াসীকে রুটি দিতে বলে আর তিনটি শিশুকে নিয়ে আনন্দ করে খায়। শিশু তিনটি অনেক সময় মা বাপের জন্য কাঁদে এবং বৃদ্ধকে বিরক্ত করে। বৃদ্ধ তখন ইয়াসীকে বলে, "এদের সান্ত্বনা করো ইয়াসী, আর যে টেকা যাচ্ছে না।" ইয়াসী সান্ত্বনা দেয়, আদর করে, শিশুরা শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে থাকে।

সেদিন সকাল বেলাটা বেশ সুন্দর দেখাচ্ছিল। আকাশে একটুও মেঘ ছিল না। সূর্য্যের আলো চায়ে গাছের উপর পড়ে যেন ঢেউ খেলাচ্ছিল। চায়ে ফল লাল হয়েছিল। হারু চায়ে ফল এনে শিশু এবং বৃদ্ধের হাতে দিচ্ছিল। শিশুরা ফলগুলি মুখে দিয়ে থু থু করে ফেলে দিচ্ছিল। বৃদ্ধ নির্বিকার চিত্তে চায়ে ফলের রস গলাধঃকরণ করছিল।

ইয়াসী ঘর হতে বের হয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল। কি সুন্দর সূর্য্যালোক, কি সুন্দর চায়ে গাছ আর কি সুন্দর তার ফল। তারপরই সে বৃদ্ধকে বললে, "রুটি হয়ে এল তুমিও খাবে আমরাও খাব, কিন্তু দাদু আমাদের গ্রামে নিগ্রো সেপাই আসবে, সেই সঙ্গে আসবে অনেক গোরা সেপাই, তখন আমাদের অবস্থা কি হবে ভেবে পাচ্ছি না দাদু।"

বৃদ্ধ দাঁড়াবার চেষ্টা করল কিন্তু দাঁড়াতে পারল না, ইয়াসীকে কাছে ডেকে আনল এবং বলল, "আমিই শুধু গ্রামে থাকব। আজই তুই হারুকে নিয়ে গ্রাম হতে চলে যাবি। যাবি মাউণ্ট কেনিয়ার দিকে। আপদ বিপদে মাউণ্ট কেনিয়া আমাদের রক্ষা করেছে, তোদেরও রক্ষা করবে। আমি বৃদ্ধ হয়েছি, মরলে আক্ষেপ করার মত কিছুই নেই, শিশুরা যদি বাঁচে তবে আমাদের জাতের নাম থাকবে। আমার মনে হয় আমাদের অন্যান্য সকলেই মাউ মাউদের সংগে যোগ দিয়েছে, তুই কি বলিস ইয়াসী?"

নিশ্চয় দাদু, তারা কি মানুষ নয়, তাদের মধ্যে কি রক্তমাংস নাই, নিশ্চয় মাউ মাউদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। দরকার হলে সকলেই মাউ মাউদের সংগে যোগ দেবে। গতকাল বিকালে এম্বু গিয়েছিলাম। সেখানে একজন ইণ্ডিয়ান বললে, আমাদের গ্রামের দিকে কড়া পাহারা

বসাবে। রিজার্ভ হতে অনেক লোক এনে আমাদের গ্রামে থাকতে দেবে। সাত নম্বর গ্রামে মস্ত বড় ছাউনী হবে। আমরা নাকি সকলেই বিপ্লবী। মাকাটি নাকি আমাদের গ্রামে আড্ডা করেছে। আমাদের গ্রাম হতে আজ যারা চলে গেছে, কাজ করবে বলে তারা আর আসবে না। একথাই সকলে বলে গেছে।

তবেই হয়েছে, আস্‌কারী আর বৃটিশ সৈন্যের সংমিশ্রণে নরপশুর সৃষ্টি হয়েছে, ইয়াসী গ্রাম থেকে পালা নতুবা বাঁচতে পারবি না। এদের হাতে মরার চেয়ে বনে জঙ্গলে না খেয়ে বন্য পশুর হাতে মরা অনেক ভালো, তুই আজই বিদায় হয়ে অন্যত্র যাবার চেষ্টা কর।

ইয়াসী একটু চিন্তিত হল, তারপর বলল, "আমরা এদের ভয়ে কি ক্রমাগত বনে জঙ্গলে আশ্রয় নেব আর এরা আমাদের গ্রামগুলি একে একে দখল করবে। মাউন্ট কেনিয়া ঘেরাও করে যদি বৃটিশ সৈন্য এক দিক থেকে লোক হত্যা করতে থাকে তবে আমরা যে নির্বংশ হয়ে যাব আমাদেরও রুখে দাঁড়াতে হবে।"

বৃদ্ধ বললে, "সত্যি কথা ইয়াসী, তোর বুদ্ধি আছে, আমরা রুখে দাঁড়াব এবং অগ্রসর হয়ে শ্বেতকায় অধ্যুষিত গ্রাম দখল করব, কিন্তু এসব করতে হলে অস্ত্রের দরকার—আমাদের অস্ত্র নাই. আমাদের অস্ত্র পেতে হবে। অস্ত্র পেতে হলেই আত্মবলিদানের দরকার। শত্রুর কাছ থেকে অস্ত্র কেড়ে নিতে হবে। শত্রুর অস্ত্র দিয়ে শত্রুকে আক্রমণ করে ঘায়েল করতে হবে। তোরা কি তাই পারবি?

ইয়াসী হাসল এবং বলল, "দাদু আজই শিশুদের নিয়ে আমি রওয়ানা হব, রওয়ানা হবার পূর্বে কতকগুলি রুটি তৈরী করে রেখে যাব। অন্ততঃ তিন দিন তুমি রুটি খেতে পারবে। জলও রেখে যাব, তোমাকে জল উঠাতে হবে না। শিশুগুলিকে কোথায় রেখে যাই ভেবে পাচ্ছি না দাদু, বল এদের নিয়ে কি করা যায়?"

এ আবার চিন্তার বিষয়, আমাদের দেশের সীমান্ত পার হয়ে গেলেই বাগাণ্ডাদের বাসভূমি। বাগাণ্ডাদের কাছে রেখে যাবি। একদা তারাও বিদেশীদের সঙ্গে লড়াই করেছিল। হ্যাঁ, মনে হয়েছে, এম্বুতে কয়েকজন বাগাণ্ডা আছে তাদের কাছে আমার কথা বলবি এবং শিশুদের দিয়ে যাবি। তাড়াতাড়ি করে রুটি করে রওয়ানা হও, সন্ধ্যার পূর্বে পৌছতে হবে। এদের ঘাড়ে করে নেওয়া যাবে না। একটা ষ্ট্রেচার করে তুই আর হারুতে নিয়ে গেলে তাড়াতাড়ি পৌছতে পারবি, বুঝলে ইয়াসী, তাড়াতাড়ি কাজ কর।

রান্না করে ইয়াসী সকলকে নিয়ে খেতে বসল। বৃদ্ধও খেতে আরম্ভ করল। কিছু খাওয়া হয়ে গেলে বৃদ্ধ বলতে আরম্ভ করল, "মানুষ যখন অর্দ্ধপশু ছিল তখন যেরূপ করে নরহত্যা করত আজ "সভ্য" বৃটিশও সেরূপ আরম্ভ করেছে। অসভ্যরা কিন্তু নারী, শিশু এবং বৃদ্ধকে হত্যা করত না। যতগুলি সম্ভব নিয়ে যেত, বাকিগুলিকে ছেড়ে দিত, আজ বৃটিশের কাছে কারো নিষ্কৃতি নাই। ভুল ইয়াসী ভুল, সবই ভুল, আমরাই বৃটীশদের ডেকে এনেছিলাম আজ সেই ভুলের শাস্তি, তোরা ভুল করিস্ নি, ভুল করেছিলেম আমরা, আমরা তার শাস্তি পাব, তোরা চলে যা। মনে আছে ইয়াসী সেইদিনের কথা, যে দিন মোম্বাসা বন্দরে পর্তুগীজ দস্যুরা আমাদের ভয়ে ভীত হয়ে একত্রিত হয়ে বন্দর ত্যাগ করেছিল, আরব পালিয়েছিল, বৃটিশ সাদা পতাকা দিয়ে মোম্বাসা দুর্গে প্রবেশ করেছিল। সেদিন বৃটিশ বলেছিল, "এদেশে তাদের কোনও স্বার্থ নাই, একমাত্র স্বার্থ পৃথিবী হতে দাসত্ব লোপ করা, আজ সেই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা আমাদের নারী, আমাদের শিশু আর আমাদের মত বৃদ্ধকে আমাদের লোক দিয়ে হত্যা করাচ্ছে। ভুল করেছিলাম আমরা, শাস্তি আমরা পাব, তোরা কেন কষ্ট পাবি ?

বৃদ্ধ আর বলতে পারল না, তার চোখ দিয়ে অশ্রু গড়াতে লাগল। সে বসে থাকতে পারল না, মাটিতে শুয়ে পড়ল। ইয়াসী বৃদ্ধকে কিছু না বলে শিশুদের হাত ধরে হারুকে আগে রেখে বড় গ্রামের দিকে বিরস বদনে রওয়ানা হ'ল। শিশুরা গ্রামের দিকে ফিরে তাকাল না, কোথায় যাবে কাউকে জিজ্ঞাসা করল না, ছোট ছোট পা ফেলে ইয়াসীর সংগে চলতে থাকল। তখন সূর্য্য আকাশের অনেক উপরে উঠেছে, চাষে গাছের পাতাগুলি নিস্তেজ হয়েছে, আশে পাশে নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে, হারু আর ইয়াসী কয়েকটি শিশুকে নিয়ে পথ চলছে।

আট-দশ মাইল যেতে হবে, এই শিশুরা এত দূর হেঁটে যেতে পারবে কি? শ্বেতকায় সাম্রাজ্যবাদীদের মতে এরাও মাউ মাউ, এরাও শত্রু। এদের হত্যা করলেও পাপ নাই, এদের মধ্যেও নাকি বর্ব্বরতা দেখা দিয়েছে। দুটি শিশু একেবারে উলঙ্গ আর দুটির শরীরের উপর অংশ ঢাকা, নীচে খোলা। এত বস্ত্র পাবে কোথায়, হরিণের চামড়া পাওয়াও কষ্টকর, টেক্স দিতে হয়। টেক্স দেবার টাকা কোথায়? অতএব অর্দ্ধ উলঙ্গ। আধ মাইল যাবার পরই একটি শিশু দাঁড়িয়ে গেল। কিছু বলল না। সে যেন বুঝতে পেরেছে, কাঁদলে কেউ সাড়া দেবে না; এরূপ করে দাঁড়িয়ে থেকেই মরতে হবে। ইয়াসী তাকে কোলে উঠাল। কি আরামের সে কোল, শিশু ইয়াসীর ঘাড়ে মাথা রেখে শুয়ে থাকল। তারপর আর একটি, তাকে দিল হারু, সেও তাই করল, কিন্তু আর একটিকে কে কোলে নেয়, হাঁটতে পারছে না; ইয়াসীর মনে হ'ল বৃদ্ধের উপদেশ। এদের কোল থেকে নামিয়ে দিয়ে চাষে গাছ দিয়ে ষ্ট্রেচার তৈরী করল, তারপর ষ্ট্রেচার নিয়ে রওয়ানা হল। ইয়াসীর মনোবল ছিল, হারু কিশোর, সে দুনিয়াটাকে কিছুই মনে করে না, তবুও সে সন্ধ্যার পূর্বে বিশ্রামার্থ ইয়াসীকে অনুরোধ করল। ইয়াসী

সকলের মুখ মুছে রুটি খেতে দিল। সকলে রুটি খেতে আরম্ভ করল। রুটি কত মিষ্টি, কত আনন্দের, তারপর বিশ্রাম। পথের পাশে শয্যা রচনা করে পাঁচজন ঘুমাল ইয়াসী ঘুমাল না, সে বসে থাকল। তার বয়সও বেশী নয়, মাত্র পনর কি ষোল, এরই মধ্যে কর্তব্যজ্ঞান তার হয়েছে, জানে সে এখন সেই শিশুদের রক্ষাকর্তা, এদের জীবন তারই হাতে, তার পক্ষে শক্তি বজায় রাখতে হবে, জ্ঞান হারালে চলবে না, এটা বাচালতার সময় নয়।

হারু উঠে বসেছে, তার শরীরে শক্তি ফিরে এসেছে, হঠাৎ আকাশে কি একটা কিছু উড়তে দেখে ইয়াসীকে ডাকল। ইয়াসী উঠেই দেখল মাথার উপর এরোপ্লেন। তাড়াতাড়ি করে শিশুদের নিয়ে বনে প্রবেশ করল। শকুন যেমন শবের অন্বেষণে আকাশে ঘুরে বেড়ায় তেমনি এক খানা জংগী বিমান নিগ্রোদের অনুসন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। বিমান থেকে মাঝে মাঝে আগুনে বোমা ফেলে দিচ্ছিল। ইয়াসীদের কাছেও একটা আগুনে বোমা পড়ল। বোমাটা মাটিতে পড়েই নীচে চলে গেল, তারপর নীচ থেকে ফেটে যখন মাটি ছিটাতে আরম্ভ করল তখন এক অপরূপ দৃশ্য দেখে ইয়াসী এবং হারু সুখী হল। তারা থাকল নির্বিঘ্নে কারণ পাশের জংগল ভেদ করে মাটির স্পিন্‌টার তাদের ক্ষতি করতে পারছিল না। এরোপ্লেনটা চলে যাবার পর ইয়াসী শিশুদের নিয়ে বড় গ্রামের দিকে এগিয়ে চলল। সারারাত পরিশ্রম করে যখন ইয়াসী এবং হারু গ্রামে প্রবেশ করল তখন শিশুরা শুকিয়ে গিয়েছিল। হারু চলতে পারছিল না, ইয়াসীর মুখের উপর মলিনতা দেখা দিয়েছিল। এদের দুরবস্থা দেখে একজন ভারতীয় ব্যবসায়ী পুনর্জন্ম এবং পাপের ফল সম্বন্ধে নানারূপ গবেষণা করতে আরম্ভ করল। এর গবেষণা শুনে পাশের দোকানের একজন গুজরাতী বেনে শিশুদের কাছে ডাকল এবং

নিজের ঘরে নিয়ে কিছু খেতে দিল। একটু বিশ্রাম করেই ইয়াসী বাগাণ্ডাদের আশ্রয়ে চলে গেল। সেখান থেকে ফিরে এসে শিশুদের নিয়ে চলে গেল বাগাণ্ডাদের বাড়ীতে। বাগাণ্ডাদের প্রতি আদেশ হয়েছিল তারা যেন কেনিয়া রাজ্য ছেড়ে চলে যায়। সেদিনই তাদের যাবার কথা, এমন সময় তিনটি কিকুউ শিশু এবং একটি কিশোরকে পেয়ে সুখীই হল। ভবিষ্যতে এরা তাদের হয়ে লড়বে, মরবে, কত কিছু করবে; এখন থেকে সকলেই কিকুউদের শ্রদ্ধা করতে শিখেছে।

ইয়াসী কোথাও গেল না, সে রয়ে গেল বাগাণ্ডাদের পরিত্যক্ত ঘরে। বাগাণ্ডারা অনেক কিছু ফেলে গিয়েছিল। ইয়াসী সেইগুলি যোগাড় করে একটা ঘর দখল করল, রান্না করল, তারপর খেয়ে শুয়ে শুয়ে ভাবতে থাকল কি করে দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করবে। সে এখন স্বাধীন, তার মা বাবা এবং একটি মাত্র ভাই সবাই চলে গেছে, সবাই মাউ মাউ দলে যোগ দিয়েছে। মাউ মাউদের দলিল সামান্যই থাকে। তাদের দলে যোগ দিলে নাম লেখাতে হয় না, কাজ করে দেখিয়ে দিতে হয়।

ইয়াসী তার মা বাবার কাছ থেকে পত্র পাবে না এবং সংবাদ পাবার উপায়ও ছিল না; উপদেশ দেবারও কোন লোক ছিল না। কোনও "থিসিস্"ও ছিল না। দেশ স্বাধীন করতে হবে, স্বাধীন হলে নিজের দেশে বসবাস করতে হবে, এর বেশি আবার থিসিস্ কি। যারাই বৃটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করেছে তারাই নিজের বিদ্যা বুদ্ধি খাটিয়ে কাজে অগ্রসর হয়েছে, অতএব প্রত্যেকটি মাউ মাউ এক একটি ইউনিট বলা চলে। ইয়াসী সেই ইউনিটে পরিণত হতে চলেছে।

ইয়াসী শুয়ে শুয়ে চিন্তা করতে আরম্ভ করল: "ধরা যাক এখানে প্রভুভক্ত কিকুউ পরিবার আসল, তাদের সংগে মিশে যাবার কি কোনও

উপায় নাই ? যদি আমি বলি মাউ মাউ আমার মা বাবাকে হত্যা করেছে, বড় ভাইকে কোথায় নিয়ে গেছে তবে আমার কথা সকলেই বিশ্বাস করবে। বিষয়টা ভালই হবে! এর পর যা করতে হবে পরে দেখব।” এই পর্যান্ত চিন্তা করে ইয়াসী ঘুমিয়ে পড়ল। সুনিদ্রা হলে স্বপ্ন দেখা যায় না, তবুও সে স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করল, কে যেন তাকে খোঁচাচ্ছে। ইয়াসী ধরফর করে উঠে বসল। দেখল একজন ইণ্ডিয়ান তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। ইয়াসীকে ইণ্ডিয়ান বলল, “এখান থেকে পালা, নতুবা নিগ্রো সেপাই তোকে মেরে ফেলবে।”

ইয়াসী বললে, “মাউ মাউ আমার মা বাবাকে হত্যা করেছে, এখন আস্‌কারী আমাকে হত্যা করলেই ভাল, আমি যাব না, এখানেই থাকব।”

ইয়াসীর কথা শুনে ইণ্ডিয়ান চিন্তিত হল এবং কতক্ষণ পরে বলল, “এই যদি তোমার বক্তব্য বিষয় তবে আমার সংগে চল। সেখানেই আসকারী আসবে প্রথম। আস্‌কারাদের কাছে তোমার হয়ে আমিও বলব।”

ইয়াসী মনে মনে হাসল এবং ইণ্ডিয়ানের সংগে তার বাড়ী গেল। ভারতবাসী মাত্রেই নিগ্রো এবং নিগ্রাণী চাকর রাখে। শ্যামলদাস ওঝাও ইয়াসীকে চাকরাণী রূপেই গ্রহণ করল। পুরুষদের ঘরে চাকরাণী রাখার নিয়ম নাই, কিন্তু এই দুর্দিনে পুরুষের বড়ই অভাব সেজন্য অনেকেই চাকরাণী রাখতে বাধ্য হচ্ছে। পুরুষেরা কাপড় কাচে না, স্ত্রীলোক কাপড়ও কাচে এতে অনেক সুবিধা বলতেই হবে। ইয়াসীকে ঘরে নিয়ে শ্যামলদাস তার ঘরটা ভাল করে দেখিয়ে বলল, “এর সবটাই তোমার এলাকা শুধু আমার শোবার ঘরে তোমার প্রবেশ নিষেধ।”

ইয়াসী ভাল করেই জানত বিবাহিত ইণ্ডিয়ান ভুলেও ভিন্ন স্ত্রীলোককে

তাদের শোবার ঘরে প্রবেশ করতে দেয় না। দ্বিতীয়তঃ যাদের ঘরে পাউণ্ড শিলিং থাকে তারা নিগ্রো চাকরকে মোটেই বিশ্বাস করে না।

শ্যামলদাস ইয়াসীকে আরও বলল, "যদি তোমাকে কেউ মাউ মাউ সন্দেহ করে তবে আমিই বলব তুমি আমার রক্ষিতা।"

ইয়াসী বাধা দিয়ে বলল, "তা হবে না, কারো রক্ষিতারূপে আত্মপরিচয় দিয়ে বাঁচবার ইচ্ছা আমার নাই, মা বসুন্ধরার বুকের উপর আমার রক্তমাংস নিক্ষিপ্ত হোক তাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু—"

শ্যামলদাস বাধা দিয়ে বলল, "সুদান এখন স্বাধীন, আরব বেদুইন আর তাদের মা বোনকে চুরি করে বাজারে বিক্রয় করতে পারে না।"

"সবাই সব পারে, আরব বেদুইনের কথা অথবা সুদানী স্ত্রীলোকের কথা অবান্তর, তাদের দেশে কি আমাদের মত যুবতী দিগম্বরী হয়ে পথে ঘাটে হাঁটতে পারে? কতটা বিপ্লব তাদের দেশে হয়েছে? আজ পর্যন্ত আমার মা বাবার কাছে সুদানীদের একটিও বিপ্লব কাহিনী শুনতে পাই নি। এসব বাজে কথা। আমি যা বলেছি এর বেশী আর কিছু আসকারীদের কাছে বলবে না।"

শ্যামলদাস বুঝল এই যুবতী সামান্য যুবতী নয়, এর মধ্যে পাটস রয়েছে, অতএব বিনা বাক্যব্যয়ে ঘর হতে চলে গেল।

ইয়াসী ইন্দারা হতে জল উঠালো, বাসনগুলি ধুলো, তারপর কোথায় কি আছে সব বের করে ডাল এবং ভাত রান্না করে শ্যামলদাসকে ডাকল। শ্যামলদাস দেখল টেবিলে উত্তম ভাত, সুগন্ধযুক্ত ডাল এবং তারই পাশে পরিষ্কার কাচের গ্লাসে এক গ্লাস জল রয়েছে। পাশেই ঘৃতের বোয়াম্ এবং নুন। উত্তম পরিবেশন। শ্যামলদাস কাঁটা চামচে

ব্যবহার করত না। হাত ভাল করে ধুয়ে আহার সমাপ্ত করে চুপচাপ ঘর হতে বের হয়ে গেল। ঘর হতে বের হবার সময় ইয়াসীকে খেতে অথবা খেয়ে শুয়ে থাকতে সেরূপ কিছুই বলল না। যেমন করে মাথা নত করে ঘরে প্রবেশ করেছিল তেমনি মাথা নত করে ঘর হতে বের হয়ে গেল।

ইয়াসী ঘর পরিষ্কার করল। নিজের বিছানা করল। কিছু খেয়ে নিল তারপর শুয়ে থাকল কিন্তু ঘুমাল না। দ্বিপ্রহর রাত্রে সে ঘর হতে বের হয়ে গ্রামের চারিদিকটা দেখল তারপর জঙ্গলের দিকে একটু যেয়েই দেখল দুটা লোক গ্রামের দিকে আসছে। তাদের পরণে মামুলী প্যাণ্ট, শরীর বিবস্ত্র। দেখেই বুঝল এরা মাউ মাউ। ইয়াসী বিড়ালের মত ডাকল। উত্তরও পেল। দুটা লোক তার কাছে এল এবং জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কে?"

—সাত নম্বর গ্রামের ইয়াসী।

—হাঁ৷ বুঝতে পেরেছি, বৃদ্ধ কে হন্?

—আমার দাদু। দাদুর আদেশে চলে এসেছি।

—বেশ করেছ ইয়াসী, এখানে কার কাছে আছ?

—শ্যামলদাস ওঝা, লোকটা কেমন বলতে পার?

—আমাদের লোক, যা বলবে তুমি তাই করবে, ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে যারা আমাদের লোক তাদের মধ্যে শ্যামলদাস একজন। ভুলেও তার ঘরে মাছ মাংস নিয়ে যেয়ো না। সে আমাদের বিশ্বাস অর্জন করতে পেরেছে। যাও আমরা মাঝে মাঝে আসব, তোমাকে পাব কি?

—কিছু বলতে পারি না, দরকার বোধে অন্যত্র চলে যেতে পারি।

আগন্তুকেরা বুঝল ইয়াসী মাউ মাউ, নিজেই একটি ইউনিট, দরকার মত সবই করবে, প্রাণও দেবে। এরা চলে যাবার পূর্বে মাউ মাউ শব্দ দুটি বার বার উচ্চারণ করে বিদায় নিল।

ইয়াসী এবার অন্যদিকে গেল। অনেকক্ষণ জঙ্গলটার পাশে বেড়াল, কিন্তু মানুষ আছে মনে হল না, কেউ তার সঙ্গে কথা বলতে বন থেকে বের হয়ে এল না। অনেক রকমের চিন্তা তার মাথার মধ্যে কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠল, কিন্তু বনের কাছে বসে কাজ করার কিছুই ছিল না, সে ফিরে গেল ঘরে। ঘর অন্ধকার। অন্ধকারের মধ্যে মাটিতে ইয়াসী অনেকক্ষণ বসে থাকল তারপর ভবিষ্যৎ কর্ম্মপদ্ধতির কথা চিন্তা করে ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুম থেকে উঠেই শুনল ইণ্ডিয়ানরা এখান থেকে চলে যাবার জন্য সত্বরই আদেশ পাবে, ইয়াসী এতে একটুও ঘাবড়াল না, দুঃখিত হল না, কি করবে সে বিষয়ে একটু চিন্তা করে সংসারের কাজে মন দিল। শ্যামলদাস দোকানে যাবে, সে স্নান করে এসেই কিছু খেতে চাইবে সেজন্য পরোটা এবং চা তৈরী করে টেবিলে সাজিয়ে রাখল। দ্বিপ্রহরের জন্য রান্না করতে হবে সেজন্য কিছু শাক সবজীর দরকার, বাজারে না গেলে কিছুই পাওয়া যাবে না। ডান হাতে বাজারের থলিয়া এবং বাঁ হাতে কতকগুলি সেণ্ট নিয়ে বের হল। এক শত সেণ্টে এক শিলিং হয়। শ্যামলদাসের শাক সবজীতে বেশি হয়ত পঞ্চাশ সেণ্টের অধিক খরচ হয় না। ইয়াসী বাজারে যাবার সময় সেণ্ট গুনতি করল না। মুঠোয় যা ওঠে তাই নিয়ে বাজারে গেল। ইচ্ছা করলেই ইয়াসী ইচ্ছামত ভাল খাদ্য তৈরী করে খেতে পারে কিন্তু সে দেশপ্রেমিক, তার কাছে খাদ্য বড় নয়, যতটুকু দরকার তার বেশী খাওয়া অথবা কোন লোভনীয় খাদ্যের জন্য চিন্তা করা ইয়াসীর চিন্তার বাইরে ছিল।

এম্বু গ্রামের অতি সন্নিকটে একখানা ছোট বাজার। বিক্রেতা সকলেই নিগ্রো, ক্রেতা সকলেই বিদেশী। বাজারে শাক সবজী থেকে আরম্ভ করে মৃত জানোয়ারের চামড়া পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। এই এলাকায়

লোক মাছ খায় না সেজন্য শুধু মাছই বাজারে দেখতে পাওয়া যায় না। ইয়াসী শাক সবজী কিনে একটা অর্দ্ধ উলঙ্গ কিকুউর কাছে বসল এবং জিনিসের দাম জিজ্ঞাসা করতে আরম্ভ করল।

অর্দ্ধ উলঙ্গ কিকুউ বুঝল এই যুবতী ক্রেতাও নয় বিক্রেতাও নয়—মাউ মাউ। যুবতীর মনোভাব বুঝতে পেরে যুবতীকে জিজ্ঞাসা করল, "কি চাও?"

—সংবাদ চাই—কিছু আছে?

—হ্যাঁ সংবাদ আছে, এদিকে সত্বরই নিগ্রো এবং বৃটিশ সেপাই আসবে, প্রস্তুত হয়ে থাকো। সাত নম্বর গ্রামে নূতন ছাউনী হবে। যদি পার তবে সাত নম্বর গ্রামের লোককে এই সংবাদ দিয়ে দিয়ো।

ইয়াসী আর কথা বলল না, ঘরে গিয়ে নিজের কাজে আত্মনিয়োগ করল। সেই সংগে ঠিক করে নিল সে কি করবে।

পরের দিন সকাল থেকেই ইয়াসীর মন পরিবর্তিত হল। সে প্রায়ই তার মা বাবার জন্য অশ্রু মোচন করত। ইণ্ডিয়ানরা ইয়াসীর অবস্থা দেখে দুঃখ প্রকাশ করত, অনেকে কিছুই বলত না। যারা কিছুই বলত না তাদের মনের অবস্থা জানবার জন্য এক দিন একজন ইণ্ডিয়ানকে ইয়াসী জিজ্ঞাসা করল, "আমাদের দুরবস্থা দেখে তোমার দুঃখ হয় না কেন?"

ভারতীয় ভদ্রলোক অল্পভাষী; তিনি বললেন, "বিপ্লবের সময় এরূপ হয়ে থাকে, কিছু না দিলে কিছুই পাওয়া যায় না ইয়াসী, অনেক বিপ্লবের ইতিহাস পড়েছি, সেই অভিজ্ঞতা হতেই তোমাকে বলছি, দুঃখ হয় কিন্তু প্রতিকার করার উপায় নাই, যদি প্রতিকার করতে হয় তবে আমাদেরও তোমাদের সঙ্গে যোগ দিতে হবে, আমরা তোমাদের দেশবাসী নই,

বিদেশী, আমাদের সরকার ইচ্ছা করেন না তোমাদের সংগে আমরা মিলিত হই। দ্বিতীয় কথা হল, বিপ্লব আমদানী রপ্তানীর মাল নয়। তোমাদের বিপ্লব যদি তোমরা না কর তবে কে করবে ?"

ইয়াসী ভারতীয় ভদ্রলোকের কথা বুঝল এবং এই বিষয় নিয়ে কারো সংগে কথা বলবে না ঠিক করল। মানুষের চিন্তার বিরাম নাই, ইয়াসীরও চিন্তার অন্ত নাই। একই চিন্তা, কি করে কেনিয়া বৃটিশের নাগপাশ হতে মুক্ত হবে। ইয়াসী শিক্ষিত নয়, ইতিহাস অথবা ভূগোল তার জানা নাই। তাদের দেশের বিস্তৃতি কতটুকু সে জানে না। কত রকমের লোক এবং কত ভাষায় লোকে মনের ভাব প্রকাশ করে অবগত ছিল না। কিন্তু সে জানে বৃটিশ তাদের দেশ দখল করে রাখছে, তাদের দেশে অন্ন বস্ত্রের অভাব নাই তথাপি তারা অভুক্ত এবং বিবস্ত্র থাকে। এই দুটি অভাব হতে মুক্ত হতে হলে তাদের অনেকেরই আত্মবলিদান করতে হবে।

দিন গেল, আবার রাত এল। ইয়াসী ঘুমাল না। দেশের সংবাদ শোনার জন্য সে ব্যাকুল। গভীর রাতে সে গেল জঙ্গলের কাছে। লোক চলাচল করে কিনা শুনবার জন্য কান পেতে রইল। কোথাও জন মানবের গতায়াত নাই। চাঁদের আলোতে আকাশ বাতাস বন উদ্ভাসিত। এমন সুন্দর সময়ে বনে বন্য জীবের অস্তিত্ব লক্ষ্য হচ্ছে না। এই সময়েই হায়েনা, নেকড়ে, বন বিড়াল খাদ্য অন্বেষণে বের হয়। বন্য জীব কোথায় গেল ? এরাও কি বৃটিশ কামান বন্দুকের ভয়ে পালিয়েছে ? এমন সুন্দর ধবধবে চাঁদের আলোতে ইয়াসী একাকী দাঁড়িয়ে ছিল। তার শরীর যৌবনে ভরা। এ সময়েই যুবতীরা গান গেয়ে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে তোলে, কিন্তু ইয়াসীর কণ্ঠস্বর রুদ্ধ। তার জাত আজ বিপন্ন, এটা গানের সময় নয়। ইয়াসী

গান গাইল না, যেদিকে দাঁড়িয়েছিল সেদিক পরিত্যাগ করে হাটের দিকে গেল। দেখল অনেক লোক বসেছে, আরও লোক আস্‌ছে। স্ত্রী-পুরুষ ভেদাভেদ নাই, সকলেই চুপ করে আসছে এবং যেখানে বসবার স্থান পাচ্ছে সেখানেই বসছে। ইয়াসী একজন স্ত্রীলোকের গা ঘেঁসে বসল।

স্ত্রীলোক জিজ্ঞাসা করল, "কে তুমি?"

—আমি সাত নম্বর গ্রামের ইয়াসী, তুমি কে?

—আমার নাম ইয়ামতী, তোমাদের গ্রাম হতে অনেক দূরে নাইরবীর দিকে বাস করতাম। আশকারী সেপাই আমাদের গ্রামে আগুন দিয়ে পুড়িয়েছে, শিশু এবং বৃদ্ধদের হত্যা করেছে। আমরা পালিয়েছি। অনেক মা এবং যুবতীও মারা গেছে, তাদের মৃত্যু কাহিনী না বলাই ভাল। যদি সেই অত্যাচার কাহিনী শোন তবে তোমার মনে আতঙ্ক হবে, তুমিও বশ্যতা স্বীকার করবে এবং রাজভক্ত হয়ে কোন রিজার্ভ গ্রামে সুখের সংসার পাততে বাধ্য হবে। ইয়াসী, তুমি পড়তে পার?

—না।

—অতি কষ্টে পড়তে শিখেছি, আমাদের গ্রাম ধ্বংস করার পরই সরকার তরফ থেকে এক প্রচারপত্র প্রকাশ করে সর্বসাধারণের মধ্যে বিতরিত হয়েছে। তাতে লেখা হয়েছে, আমাদের গ্রাম মাউ মাউ আক্রমণ করে বৃদ্ধ এবং শিশু নিবশেষে সকলকে হত্যা করেছে। তুমি যদি পড়তে জানতে তবে তোমাকে একখানা প্রচারপত্র দেখাতাম। কত বড় মিথ্যা এরা সাধারণ লোকের মধ্যে প্রচার করেছে চিন্তা করলে গা শিউরে উঠে। আমাদের বিভ্রান্ত করার জন্যই এই মিথ্যা প্রচার' পত্রের বিতরণ। যাতে আমরা কেউ বিভ্রান্ত না হই সেজন্য আমরা একত্রিত হয়েছি, একটু পরেই শুনবে আমাদের নেতা মাকাটি কয়েকটি

কথা বলবেন, তারপরই আমরা চলে যাব। তুমি কোথায় থাক ইয়াসী ?

—এখানেই।

—এখানে বিদেশী থাকে, তুমি কি বিদেশীদের সংগে থাক ?

—হঁ্যা, শ্যামলদাস ওঝার বাড়ীতে।

—শুনেছি লোকটা ভাল, যতদিন পার থেকে যাও, তারপর যা ইচ্ছা হয় করো, এখানে সত্বরই বৃটিশ সেপাই আসবে।

—হঁা শুনেছি, ভয়ের কারণ নাই।

কতক্ষণ পরে মাউ মাউদের দলপতি মিঃ মাকাটি আসলেন। অনেকটা বিবস্ত্র বললেই চলে। এসেই তিনি বললেন, "মাউ মাউ ভাই ভগ্নী, এখন থেকে আমরা প্রতিআক্রমণ করব স্থির করেছি, সকলেই সেই অনুযায়ী কাজ করবে।"

এখানেই কথার শেষ এবং সভারও শেষ। মাউ মাউ বেশী কথা বলে না, ডেকে এনে দল ভারী করে না। যার ইচ্ছা হয় এস—প্রাণ দাও, এর বেশী আদেশ এবং উপদেশ দেবার মত আপাততঃ তাদের নাই। এই করেই আরম্ভ হল মাউ মাউদের বিপ্লবের ইতিহাস।

—"যদ্যপি গৃহে কালসর্প থাকে, সেই গৃহে বাস করিতে হইলে যেমন সর্ব্বদা ভয়ে ভয়ে থাকিতে হয়, সংসারে সেইরূপ ভয়ে ভয়ে থাকিবে।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

(উপন্যাস—পূর্ব্বানুবৃত্তি)

দেবেশ দাশ

(১১)

তুমি ? দেবল ?

মিতা ?

কথাটা প্রশ্ন না উত্তর তা বোঝা গেল না। দেবলের গলা কে যেন টিপে ধরেছে। যেন ওর নিজের হাতের রিভলভারটাই ওর মাথার উপর তাক করে ধ'রে রেখেছে কেউ।

হাতঘড়িটা টিক টিক করে চলছে কি না সেদিকেও দেবল তাকাতে পারছে না। গরম তেমন কিছু নয়। কিন্তু বিন্দু বিন্দু ঘাম তার কপালে চিক চিক করে উঠেছে। কাম্বিসের ফোল্ডিং ক্যাম্প চেয়ারটা মিতা ওর দিকে এগিয়ে দিল।

তার পরই মিতা একবার চকিতে চার দিকে বাইরে তাকিয়ে নিল। পাশের খুপড়ীতে গিয়ে বাইরে থেকে আসার দরজাটা বন্ধ করে দিল। ফিস ফিস করে জিজ্ঞেস করল—হাবিলদার সেন্‌ট্রিটা টের পেয়েছে কি? না ওকে শেষ করে দিয়েছ?

শত্রুপক্ষের কাউকে শেষ করে দেওয়ার কথায় এতক্ষণে দেবলের যেন জ্ঞান ফিরে এল। কোন রকমে বলল—ওর হাত পা মুখ বাঁধা।

কিন্তু এই যে ওয়াক-আইয়ের খাকি ইউনিফর্ম পরে হরেক রকমের যন্ত্রপাতির সামনে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটী—এই যে মিতা—সেও ত শত্রু পক্ষের।

দুজনেই দুজনের দিকে তাকিয়ে রইল।

জিংকের ওয়াটার বটল থেকে জল আর কাগজের কার্টন থেকে 'চক' বিস্কুট আর পাতলা করে কাটা মাংস দেবলের সামনে এনে ধরল মিতা। খুব শান্ত ভাবে অথচ হুকুমের স্বরে বলল—চট করে খেয়ে নাও। ব্রাণ্ডি চাও ত দিতে পারি। আর এই "হুমলি স্ল্যাব"গুলি পকেটে রেখে দাও। মাঝে মাঝে খেয়ো। 'ভিটামিন সি'র অভাব তোমার মুখে ফুটে উঠেছে।

হায়! দেবল কাকে সামনে দাঁড়ান দেখছে এখন! এত দিনের স্বপ্ন, এত দিনের প্রত্যাশা। মিতা তার মুখে শুধু ভিটামিনের অভাব দেখল এতদিন পরে? দেবলের ঠোঁট শুকিয়ে উঠল। একবার জিভ দিয়ে সে উপরের ঠোঁটটা ভিজিয়ে নিল। তারপর উপরের ঠোঁট দিয়ে নিচের ঠোঁট ভেজাবার চেষ্টা করল। যেন মরুভূমির জ্বালা নেভানো যাবে এক ফোঁটা জলে।

আবার মিতাই কথা বলল—তোমার হাতে খুব বেশী সময় নেই, দেবল। আমাদের "ও, পি"র অর্থাৎ নজর করার ঘাঁটির লোকেরা মায় অন্য ওয়াক-আইরাও সবাই গিয়েছে মাইল পাঁচেক দূরে। সেখানে নতুন একটা "ও, পি" খোলা হচ্ছে। সেই অবজার্ভেশান পোষ্টের সঙ্গে বেতারে এইমাত্র কথা হয়েছে। ওরা এখনি রওনা হবে। রওনা হওয়ার সংকেত পাশ ওয়ার্ড এইমাত্র দিয়ে দিয়েছি।

মিতা এত তাড়াতাড়ি, এত চাপা গলায় ব্যস্ত সমস্তভাবে কথা বলে চলল যে দেবল সব কথা শুনতেই পেল কি না কে জানে।

সে শুধু হতভম্বের মত মিতার দিকে তাকিয়ে রইল। মিতার মুখ, মিতার চোখ, মিতার ইউনিফর্মের দিকে।

মিতা সবই বুঝল। বলল—খুব অবাক হয়ে গেছ, এই ত? কিন্তু শোন দেবল। এক মুহূর্ত্তও সময় নেই তোমার হাতে। তুমি যে কেন আই-এন-এ-তে যোগ দিয়েছ তা বুঝি। কিন্তু আমি কেন ওয়াক-আই-এ জুনিয়ার কমাণ্ডার হয়ে এখানে এসেছি তা বুঝতে নিশ্চয়ই পারছ না।

দেবল কোন রকমে মুখ খুলে বলল—তুমিও কি আমার মত······ তোমায় দেখতে······

অত্যন্ত ব্যস্তভাবে মিতা দেবলের কথায় বাধা দিল,—না, না, তুমি ভুলেও ভেবো না যে আমি তোমার সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে যাবার আশা নিয়ে লড়াইয়ের এলাকায় এসেছি। আমি দেশ স্বাধীন করতেও আসিনি। জাপানীর হাত থেকে দেশকে বাঁচাতে আসিনি।

তবে—তবে কেন তুমি ওয়াক-আই-তে ঢুকেছ? কেন এই ঘোর বিপদের মধ্যে, পশুর মত সৈন্যদের মাঝখানে এসেছ। মিতা, এ তুমি কি করেছ?

অস্থির হয়ে ছুটে সামনে এসে দেবল মিতার হাত দুটি চেপে ধরল। পাগল রক্তধারা বইছে তার হাতের শিরায় শিরায়। বলতে চাইছে লক্ষ লক্ষ কথা।

মিতা হাত ছাড়িয়ে নেবার কোন চেষ্টাই করল না। সম্মোহিতের মত তাকিয়ে রইল দেবলের দিকে। যেন ঘুমের মধ্যে নিশিতে পেয়েছিল বলে উঠে দাঁড়িয়েছে। এক পা আধ পা করে মিতা পেছিয়ে যেতে লাগল। নিজেরই অজানতে বিনা চেষ্টায়, বিনা ইচ্ছায়। প্রত্যেকবার পিছু হটে, আবার একটু আসে। আবার একটু পিছু হটে। যেন

ওই সব তার আর বেতারের যন্ত্রে মিতার পদক্ষেপ তালে তালে মাপা আছে : নিয়ন্ত্রিত করছে তার পিছু হটাকে।

দেবল এতক্ষণে জেগে উঠেছে। বিস্ময়ে নয়, বেদনায়! গভীর ভাবে সে মিতার চোখের উপর চোখ রাখল। যেন অতলান্ত মহাসাগরে জলের গভীরতা মাপছে। মিতার চোখে একটু যেন ভীরু বন-হরিণীর ছটফটানি, অসহায় ব্যথার চঞ্চলতা। একবারে চুপ করে রইল মিতা। দেবলের কথার জন্য প্রতীক্ষা করতে লাগল।

ব্যাকুল হয়ে দেবল আবার জিজ্ঞেস করল—কই, মিতা জবাব দিলে না যে।

আরো বেশী ব্যাকুল হয়ে মিতা বলল—সব বলব। কিন্তু তুমি কথা দাও যে ঠিক আধ ঘণ্টা পরে তুমি চলে যাবে। ওরা নিশ্চয় ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে এসে পড়বে। নিচে হাবিলদারটা বাঁধা আছে। তোমায় খুঁজে বের করতে চেষ্টার কসুর করবে না। এ কি সর্ব্বনাশ তুমি করলে দেবল।

—না, তোমায় ছেড়ে আমি যাব না, একটুও যাব না। এত বছর পরে তোমায় দেখলাম। আর তোমায় ছেড়ে যাব না।

বিদ্রূপ করে উঠল মিতা—হাউ রোমান্টিক অব ইউ, দেবল। চমৎকার। এতই ভালবাস তুমি, যে যাকে ভালবাস বলে মনে কর তার চোখের সামনেই হাতের কাছের গাছ থেকে না ঝুলে পড়লে মনে শান্তি পাবে না।

চুপ করে রইল দেবল।

মিতা ব্যঙ্গের মাত্রা আরো বাড়িয়ে দিল—অথবা বোধ হয় ভাবছে যে যাকে ভালবাস তাকেও ফাঁসান দরকার। জীবনে এত ভালবাস বলে ভেবেছ যে মরণেও একটা সহমরণ ঘটাতে না পারলে কীর্ত্তি রেখে যাবে কি করে?

দুঃখে দেবলের মুখ যেন একটু কালো হয়ে গেল। সে বলল—তুমি আমার কোন কথাই শুনলে না, শুধু তাড়িয়ে দিতেই ব্যস্ত।

হ্যাঁ, ঠিক তাই। তোমার নিজের জন্য নয়; তোমার আই-এন-র জন্য, তোমার নেতাজার জন্য। তুমি না সামরিক অফিসার?

দেবলের মনে পড়ল একদিন মিতা দু'চোখ মেলে দেবলের দিকে তাকিয়েছিল—পুরোপুরি দৃষ্টিতে, একেবারে সামনা-সামনি। সেদিন সে আঁখি দুটী তার বুকে উইনচেষ্টার রিপিটিং রাইফেলের গুলি ছুড়ছে মনে হয়েছিল। আজো ঠিক তেমন করেই মিতা পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

আই-এন-এ-র কর্ণেল ও ওয়াক-আই জুনিয়ার কম্যাণ্ডার। শুধু দেবল আর মিতা এ-ই ত ওদের সম্পূর্ণ পরিচয় নয়।

আস্তে আস্তে দেবল বুক চিতিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়াল। বলল—তুমি ঠিকই বলেছ মিতা। আমি ত শুধু দেবল নই। তার আগে আমি মিলিটারি অফিসার। নেতাজীর জয় হোক।

কাগজের গ্লাসে জল খেয়ে দেবল একটু পরে আবার জিজ্ঞাসা করল—কই, তুমি ত' বললে না তোমার কথা।

—বলব। কিন্তু তুমি আগে একটু খেয়ে নাও। তোমরা আই-এন-এ-তে কি খেতে পাও তা আমাদের অজানা নেই। বলতে বলতে খুব শান্ত মনে অথচ হাত চালিয়ে মিতা একটী সিল করা টিন গরম জলে বসিয়ে গরম ক'রে কেটে নিয়ে তা থেকে রান্না করা ভাত আর মাংসের তরকারী বের ক'রে নিল। ইংরেজ পক্ষের ভারতীয় সৈন্যদের জন্য সব রকম বন্দোবস্তই জাপানী যুদ্ধের এলাকায় ১৯৪৪ সনে তৈরী হয়ে গিয়েছিল।

সেই ক' মিনিট দেবল চুপ করে শুধু মিতার দিকে তাকিয়ে রইল।

সেই সুঠাম তনু দেহ। ফিটফাট খাকি ইউনিফর্মে ঘেরা তনু কোমলে কঠোরে অপরূপ দেখাচ্ছে। শুধু শ্যামল রূপে নয়, ব্যক্তিত্বে ঝলমল করছে মিতা। এতদিন জঙ্গলে পাহাড়ে ঘুরে ঘুরে মেঠো, না হয় পাথুরে পাতা-পচা গন্ধ দেবলের নাকে বাসা বেঁধেছিল। সে গন্ধ আর নেই। একটা সৌরভ মিতাকে যেন ঘিরে আছে; সেটাই যেন দেবলের মরণ-অভিযানের সাক্ষী হয়ে থাকবে এখন থেকে। মিতা যখন একটু নীচু হয়ে কাগজের হাল্কা প্লেটে মাংস ঢালতে লাগল তখন তার সেই বঙ্কিম ভঙ্গী পৃথিবীর সেরা শিল্পীদের কল্পনাকে লজ্জা দিয়ে গেল। তার হাত কি তাড়াতাড়ি অথচ সুন্দরভাবে কাজ করে যাচ্ছে! তার চোখ দেবলের দিকে চকিতে তাকিয়েই বাইরের অন্ধকারের দিকে মেলে ধরছে। তার হাই-হিল-পরা পা দু'খানি যেন গতিকে যোগাচ্ছে গানের ছন্দ। বীর নারী; শুধু বরনারী নয় মিতা।

চট করে একটা সাউণ্ড ডিটেক্টার যন্ত্রের চাবী খুলে দিল মিতা। অনেকখানি জায়গার মধ্যে যা কিছু আওয়াজ হবে তার চাপা প্রতিধ্বনি শোনা যাবে এই যন্ত্রে। কি জানি যুদ্ধের দিনকালে শুধু একটা জানা দলই যে এদিকে আসবে এমন কোন ঠিক ঠিকানা নেই। কোন অজানা টহলদারী দলও ত আসতে পারে।

কিন্তু মিতা যেন একটা যন্ত্র হয়ে গেছে। যন্ত্রের মত সব কিছু করে যাচ্ছে চটপট। অথচ একটি বারও সোজাসুজি দেবলের চোখের দিকে তাকিয়ে থাকছে না। এদিকে দেবল এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছে; তার দৃষ্টি ওর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভাবছে যে এই কটা বছর যেন সে বেঁচেই ছিল না। সে ত' বাঁচা নয়, সে যে মৃত্যু! প্রতিদিনকার প্রতি নিমেষের সব কাজের মধ্যেও জেগে জেগে মৃত্যু।

মিতা কাগজের প্লেটটা একটা বেতের টেবিলে চাপিয়ে এগিয়ে এল।

দেবলের স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল। কোথায় জীবন, কোথায় মৃত্যু, কোথায় স্বপ্ন। এই মুহূর্ত্তটিতে মিতাই একমাত্র সত্য। মিতার হাত ধরে আলগোছে একটু টান দিয়ে বলল—এবার বল তোমার কথা, মিতা।

আমার কথা? ম্লান হেসে মিতা বলল—আমার কথা বলতে আর কি আছে? তুমি খেয়ে নাও। তোমায় যে এখনি গা ঢাকা দিতে হবে।

আমি খাচ্ছি। তবু, তবু জানতে চাই তোমার কথা। শিগ্‌গির বল মিতা। সব বল আমায়, আমায় সংশয় দোলায় এমন করে ঝুলিয়ে রেখো না।

তবে শোন আমার কথা। তুমিই ত আজাদ হিন্দ বেতারে প্রায়ই বক্তৃতা দিতে। তাই না? তোমার গলা থেকেই চিনেছিলাম।

আনন্দে দেবল খাওয়া ছেড়ে মিতার হাত দুটি আবার জড়িয়ে ধরল। ধীরে ধীরে মিতা হাত ছাড়িয়ে নিল। ইসারায় তাড়াতাড়ি খাওয়া সেরে নিতে বলল।

তুমি যখন আজাদ হিন্দ রেডিওতে ছিলে দেশের সব খবরই জান। জাপানীরা এসে পড়বে এই ভয়ে কর্ত্তারা বাংলা দেশের সব ধান চাল নষ্ট করে ফেলল। নৌকো ডুবিয়ে দিল, বাস লরী করল আটক। একটা গোটা দেশের লোক সবাইকে গুলি চালিয়ে মেরে ফেলা চলে না। তাই তাদের তিলে তিলে খাওয়া বন্ধ করে মুষড়ে রাখার নাম দিল ডিনায়্যাল পলিসি। সে বঞ্চনা জাপানীকে না বাঙ্গালীকে সে হিসাব কেউ রাখল না। জান, অন্ততঃ লাখ তিরিশেক লোক বাংলা দেশে না খেতে পেয়ে মরেছে?

জানি না আবার? নেতাজী ত' বাংলা দেশের জন্য বর্মা আর শ্যাম থেকে জাহাজ বোঝাই চাল বিনা দামে পাঠাতে চেয়েছিলেন। দুষমণ ইংরেজ তার জবাবই দিল না।

দিল না বটে, কিন্তু র‍্যাশনের বন্দোবস্ত করে এমন অবস্থা করল যে যুদ্ধ চালু রাখার কাজে ব্যস্ত আপিস গুদাম, কলকারখানা এসব ছাড়া আর কোথাও কাজ করলে খেতে পাওয়া শক্ত হয়ে উঠল। দলে দলে লোক সরকারী আপিসে অস্ত্র তৈরীর কারখানায়, সিপাই দলে কাজ নিল কেবল র‍্যাশনের চাল, ডাল, কয়লা পাবে বলে। সবাই প্রার্থনা করতে লাগল যেন ইংরেজ রাজত্বের ভিৎ বাংলা দেশে না ধ্বসে যায়। তা'হলে যে র‍্যাশনটুকু বন্ধ হবে।

তুমিও বুঝি তাই…… ?

করুণ বেদনায় দেবলের গলা আটকিয়ে গেল। সে আর কথাগুলি শেষ করতে পারল না।

হ্যাঁ, ঠিক তাই। কিছুদিন ক্লাবের মিলিটারী মেম্বারদের দৌলতে র‍্যাশনের বন্দোবস্ত হচ্ছিল। কিন্তু ওরা তার যে দাম আদায় করতে চায়…থাক সে সব কথা। তা'ছাড়া ওরা আরো সুবিধাজনক রিশেপ্‌শনিষ্ট চেয়েছিল। ক্লাবটার চেহারা বদলে যাচ্ছিল তাড়াতাড়ি।

কিন্তু তুমি 'ওয়াক-আই' হয়ে এলে কেন ? সেইটেই ত' আমি বুঝতে পাচ্ছি না। একটু অধীর হয়ে প্রশ্ন করল দেবল।

মিতা একটুক্ষণ চুপ করে রইল। পরে আস্তে আস্তে বলল—আমি স্মার্ট হতে পারি, ইংরেজী নবীশ আধুনিকা হতে পারি, কিন্তু ইউনিভার-সিটির ডিগ্রি ত' আমার নেই। কাজেই সরকারের সাপ্লাই দপ্তরে সব চেয়ে ছোট কেরাণী হওয়া ছাড়া মা ভাইবোনদের মুখে অন্ন যোগাবার আর কোন্ পথটা খোলা ছিল ? কিন্তু তাতে এই মাগ্‌গি আর আকালের দিনে এত জনের পেট ভরত না।

কিন্তু তোমার এত চেনাশোনা ছিল যে একটা অপিসারের প্রাইভেট সেক্রেটারীও ত' হতে পারতে। সেটা ত' রেস্পেক্টেবল হত।

মিতা আর ধৈর্য্য রাখতে পারল না। একটু রাগ দেখিয়েই বলল—ডোণ্ট বি এ ক্যাড, দেবল। রাস্তার দু'ধারে কাতার দিয়ে লোক মরে পড়ে আছে খেতে পায়নি বলে। তাদের ডিঙ্গিয়ে ডিঙ্গিয়ে অন্ধকার থাকতেই লোক লাইন দেয় কয়লার গুদামে, চালের দোকানে। মেয়েরা রাস্তায় বের হতে পারে না, পরনে আস্ত কাপড় নেই বলে। কাজে নামতে পারে না, মেয়েদের নিরাপদে সম্মান বাঁচিয়ে চলাফেরা করার পথ নেই বলে। আর তুমি বক্তৃতা দিতে সুরু করলে কোন্ কাজে ইজ্জত আছে আর নেই সে সম্বন্ধে। জাহান্নমে যাক তোমার জাত আর ইজ্জত।

ব্যাকুল ভাবে দেবল প্রশ্ন করল,—তবু, তবু তুমি যে অন্য কোন পথ না পেয়েই এই কাজে এসেছ তাও ত' বিশ্বাস হয় না। জীবন সংগ্রামে তুমি ডুবে যাবে এমন ভয় ত' নেই।

ভেসে থাকতে পারব এমন ভরসাই বা কে তোমায় দিয়েছিল, দেবল? করুণ সুরে উত্তর দিল মিতা।

—না, তবু মনে হয় আরো কোন কথা আছে এর মধ্যে।

একটুক্ষণ চুপ করে রইল মিতা। একটুখানি ভাবল। তারপর বলল—তবে শোন, সে সব কথা। তোমার কোন সুখ হবে না, তবু শুনতে যখন চেয়েছ তখন শোন। আমি যে পাড়ায় ছিলাম সেখানে প্রায় সবগুলো বাড়ী মিলিটারীতে চব্বিশ ঘণ্টার নোটিসে রিকুইজিসন করে নিল। কিছু টাকা দিল বটে। কিন্তু কলকাতায় টাকা দিলে বৌ মেলে এন্তার, বাড়ী মেলে না একটাও। যেখানে উঠে আসতে হল সেটা বস্তিগোছের পুরানোকেলে ছোট মনের লোকদের আড্ডা। কালো কাফ্রি সৈন্যেরা রোজ রাতে দেয় হানা। রোজ দিনে চরিত্রবানরা মিছিল করে দাঁড়িয়ে থাকে চোখ দিয়ে গিলবার জন্য। বেয়া ধরে গেল

মানুষ জাতটার উপর। যুদ্ধটা হচ্ছে বিদেশে। কিন্তু দেশে মারা গেল গোটা জাতের চরিত্র।

খুব মৃদু স্বরে মাথা নীচু করে দেবল বলল—কিন্তু ঘেন্না ধরে গিয়ে হার স্বীকার করবার লো তুমি নও মিত্র

—না, তা আমি নই। সেজন্যই একদিন পাড়ার মধ্যে দিয়ে গটগট করে হাই-হিলের ঢেউ তুলে ওয়াক-আই ইউনিফর্ম্ম পরে চলে এলাম। একেবারে জুনিয়ার কমাণ্ডার। মিসি সাহেবকে সেলাম করতে পথ পায় না তখন। আর কি চাই, বল?

আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল দেবল—উঁহু, চোরের উপর রাগ করে মাটিতে ভাত খাবার লোক তুমি নও, মিতা। তুমি তার চেয়ে অনেক উপরে, অনেক বড়।

ঠোঁট একটু বাঁকিয়ে হাসল মিতা,—হ্যাঁ, সেটুকু ভেবেও সান্ত্বনা।

আর সুখ?—দেবলের মুখ করল প্রশ্ন; কিন্তু মন ত উত্তর আগে থেকে জুগিয়ে রেখেছিল।

এক মুহূর্ত্ত পরে দেবলই আবার নীরবতা ভাঙল। বলল—কিন্তু মিতা, এর পিছনে আরো কোনো কথা আছে। হয়ত কোন ব্যথা। হয়ত কোন······

দেবলের মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে মিতাই বলল—তুমি ঠিক ধরেছ দেবল। আছে আরেক জন। তার কথা তোমায় আজ নাই বা বললাম।

আ-রে-ক জন?—যেন একটী যন্ত্র এই কথাগুলি পুনরাবৃত্তি করল।

—হ্যাঁ, তাই। কিন্তু তা' নিয়ে তোমার মনে কোন তোলপাড় করো না দেবল। ভুলে যাও, ভুলে যাও সে সব কথা। আজ তুমি আই-এন-এ কর্ণেল দেবল আর আমি শুধু 'এলাই' দলের একজন জুনিয়ার কম্যাণ্ডার। এই ক' মিনিট পরে শুধু এই পরিচয়টুকুই থাকবে। মনকে চঞ্চল

করো না, দেবল। ফর ওল্ড্ টাইম্স সেক (পুরোনো কালের দোহাই)

টাইম? সময়? তা সে অক্ষয় হয়ে গাঁথা রয়েছে দেবলের মনিবন্ধে। অজানতে দেবলের চোখ তার মণিবন্ধে ঘড়িটার উপর এসে পড়ল।

মিতার নজর এড়াল না সেটুকু। সে উঠে এল দেবলের কাছে। তার কাঁধে হাত রেখে সান্ত্বনার সুরে বলল—কিন্তু দেবল, আমি যে একেবারে অসহায়। একেবারে নিরুপায়। তার জন্যে আমি সব করতে পারি। সে যে এসেছে এই আসাম-বর্ম্মা ফ্রণ্টে। তোমাদেরই বিরুদ্ধে লড়েছে সে। কাজেই···।

বুঝেছি, বুঝেছি মিতা। তুমি! ওঃ তুমি ··। হায় কেন আজ তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল?

দেবল একবার উঠে পড়বার চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না। পা দুটো অবশ হয়ে গেছে। ঠিক মনেরই মত।

মিতা আবার করুণ সুরে বলল—দেবল, ক্ষমা করো। আমায় ক্ষমা করো। আমি আজ তোমায় কিছুই জানাতে চাইনি। তুমি বার বার জিজ্ঞেস করাতে কেমন করে বের হয়ে গেল। তুমি কিন্তু মুষড়ে পড়ো না। তুমি যে বীর।

বীর? কথাটা হঠাৎ ধাক্কা দিল দেবলের মনে। বীর? হ্যাঁ, এই কথাটা দিয়েই তাকে সম্বোধন করেছিল মিতা গঙ্গার ধারে। শুধু বীর নয়। বীর আমার। বীর সে ত আছেই। তবু যার চোখে বীর হবার সাধনা, তার কেউ নয় সে আজ?

উত্তেজিত হয়ে উঠল দেবল। বীর? বীর? বীর কি কখনো দুর্ব্বলের মত, অসহায়ের মত হার বরণ করে নেয়? সে ত এই মনের

ক্ষেত্রে, এই ভালবাসার লড়াইয়েতেও বীর হতে পারে। আবার মিতার মনোহরণ করতে পারে।

দৃঢ় কণ্ঠে সে বলল, একদিন তুমি বলেছিলে আমায়—বীর আমার। আজ 'আমার' কথাটি খসে গেছে। আবার সে কথাটুকু যোগ করবার সুযোগ আমি চাই। তুমি আমারই থাকবে মিতা, শুধু আমারই। আর কারো নয়।

কি করে তা সম্ভব, দেবল?

সে কথা কানে না তুলে দেবল বলল—এই ত' মাত্র ক' মাস আগেও তুমি অনেক ভেবে চিন্তে বুদ্ধি করে অল ইণ্ডিয়া রেডিয়ো থেকে আমার কাছে তোমার খবর পাঠিয়েছিলে। কেন পাঠিয়েছিলে?…কেন এত বিপদের ঝক্কি মাথায় তুলে নিয়েছিলে? সে ত' শুধু আমায় ভালবাস বলেই। না, আমি তোমার কথায় বিশ্বাস করি না। তুমি আমাকেই ভালবাস। তোমার আজকের বানানো কথায় আমি ভুলব না, মিতা।

ভালবাসা? সে যে বড্ড বড় কথা হয়ে গেল দেবল। তুমি একবারে ছেলে মানুষ। রেডিওতে খবর পাঠিয়েছিলাম, শুধু তুমি শুনতে পেলে মনে ভরসা পাবে সেজন্য। ভালবাসার কোন কথা নেই তাতে। সংসারের কিছুই বোঝ না তুমি। কত জটিল মানুষের মন।

মাথা ঝাঁকানি দিয়ে দেবল আপত্তি জানালে,—তা হোক, তবু ভালবাসা সোজা সহজ কথা। হয় ভালবাসি, না হয় বাসি না। এর মধ্যে কোন ফাঁকও নেই, ফাঁকিও নেই—তোমার মত 'অনেষ্ট' মেয়ের কাছে।

ম্লান হাসল মিতা। যেন আসাম সীমান্তের পাহাড়ের চূড়ায় সূর্য্যাস্তের করুণ আভা। বলল—আমি এখনো অনেষ্ট ভাবেই বলছি,

দেবল। আমি তোমায় ভালবাসিনি। ভালবাসতে অনেক চেষ্টা করেছি। কিন্তু মনকে তোমার দিকে ফেরাতে পারিনি। বিশ্বাস কর দেবল।

প্রায় চেঁচিয়ে উঠে দেবল বলল—সব বুঝি আমি, সব বুঝি। আমি যাতে আবার তোমার কাছে আসবার চেষ্টা করে বিপদে না পড়ি সেই জন্যেই তুমি এই কথা বলে আমায় ভোলাবার চেষ্টা করছ। কিন্তু দোহাই তোমার মিতা, আমি না হয় তোমার সন্ধানে আসব না। তবু বল যে আমায় ভালবাস।

চুপ করে রইল মিতা।

যে এত সরল, এত বিশ্বাসী, তাকে এত মিথ্যা সান্ত্বনা দিয়ে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে কি করে পাঠাবে মিতা?

ভালবাসা মানুষকে উদ্‌ভ্রান্ত করে দেয়। মনকে চঞ্চল করে রাখে। আজ যদি দেবলকে এমন একটা আশা দিয়ে এই আঁধারের মধ্যে ছেড়ে দেয়—আনন্দে, মিথ্যা আনন্দের বালুচরে অসাবধানে তার পা আটকিয়ে যাবে। বরং যদি সে শূন্য মনে ফিরে যায় একটা আক্রোশ, সম্ভবত ভাগ্যের সঙ্গে বোঝা পড়ার চেষ্টা, আসতে পারে তার মনে। তার ফলে সে একটু সাবধান হতে শিখবে। সহজে শত্রুর নজর এড়িয়ে নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করবে।

মিতা দেবলের কাছে অনেক আশা করে। আশা করে যে মিলিটারীতে ঢুকে তার মন আগের চেয়ে অনেক বেশী শক্ত হয়েছে। নরম মাটি যুদ্ধের আগুনে পুড়ে শক্ত হয়েছে। বেদনার কথা শুনেই ভেঙ্গে পরবে না।

সামনে উঠে এসে মিতার মুখোমুখি দাঁড়াল দেবল। গলার স্বরে নেই এতটুকু কাঁপন, একটুও দুর্ব্বলতা। মিতার চোখে চোখ রেখে দেবল

শুধাল—তবে তবে, কেন আমায় এতদিন ভুল আশা দিয়েছিলে? ভালবাসার ভাণ করেছিলে?

আশা ত' তোমায় দিই নি দেবল। আমি নিজেই আশা করেছিলাম। ভেবেছিলাম নিজের মনকে আবার গড়ে নিতে পারব। নিজেকে ভুলিয়ে রেখেছিলাম তোমার সঙ্গে মিশে। ভালবাসতে চেষ্টাও করেছিলাম। আমি করছিলাম চেষ্টা, আর তুমি গিয়েছিলে ডুবে। তা-ও বুঝতে পেরেছিলাম।

তবে? দেবল সমস্তটা সত্ত্বা দিয়ে যেন উত্তরের প্রতীক্ষা করতে লাগল।

—আশা করেছিলাম যে তোমার মতই আমিও সব ভুলতে পারব। একেবারে পরিত্রাণ পাব। কিন্তু নিজের মনকে নিয়ে তুমি এত বেশী তন্ময় ছিলে যে আমার মনের দ্বন্দ্বের কথা তোমায় জানাতে পারিনি। সুযোগও হয়নি তার। বরং আশা ছিল যে তোমায় কোন দিন সত্যি ভালবাসতে পারব।

—কিন্তু—কিন্তু আমিও ভাল বেসেছিলাম তোমায় মিতা। সেটাও কি মিথ্যা?

—ভালবাসা সহজ দেবল। কিন্তু অনেক, আরো অনেক বেশী ভাগ্য থাকলে তবে যায় ভালবাসা পাওয়া।

কঠিন হয়ে উঠল দেবল। ওঃ তোমার নিজের অভিজ্ঞতা বুঝি?

মাথা নিচু করে উত্তর দিল মিতা,—সত্যি তাই। আমি আগে একজনকে ভাল বেসেছিলাম। শুধু সেইটুকুই তোমায় জানাতে মন সরেনি। তার নতুন ঝকঝকে মিলিটারী ইউনিফর্ম, নতুন কায়দায় গোরা অফিসারদের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া, ক্লাবে ডিনারে ডান্সে প্রজাপতিদের সঙ্গে উড়ে বেড়ান—ঐ সবই আমার চোখ ঝলসিয়ে দিয়েছিল। মনকে দিয়েছিল

রাঙিয়ে এখন তুমি বুঝবে কেন আমি সেই ক্লাবেই কাজ নিলাম, কেন ওয়াক-আই হয়ে এই বিভূঁয়ে বসে আছি।

—কিন্তু আমি? দেবল এই পর্য্যন্ত বলেই চুপ করে গেল। যেন তার আর কিছু বলবার নেই।

মিতাই বলল—বিশ্বাস কর দেবল, আমি চেয়েছিলাম তোমায় ভালবাসতে। চেষ্টা করেছি অনেক। করেছি মনের সঙ্গে অনেক বোঝা-পড়া। তবু, তবু—তাকেই ভালবাসি—এখনো।

স্তব্ধ হয়ে গেল দেবল। টেরও পেলনা কেমন করে চুপ করে কথা শোনার মধ্যেই তার গলা শুকিয়ে উঠল। বুঝতেই পারল না তার জীবনে কি একটা মর্ম্মান্তিক আবিষ্কার এসে গেল। শুধু চুপ করে রইল সে।

কিন্তু চারদিকে যুদ্ধের আবহাওয়া, মৃত্যুর নিমন্ত্রণ। তার মধ্যে জীবনের সঙ্গে অভিসারের সময় কোথায় একজন যোদ্ধার? দেবল নিজেকে সামলিয়ে নিল। সমবেদনার স্বরে জিজ্ঞেস করল—কিন্তু এখন কি তার কাছ থেকে কোন সাড়া পেয়েছ?

মাথা নীচু রেখেই মিতা উত্তর দিল—আমি জানি সে আমায় জানে, কিন্তু এখনও ভালবাসে না। কিন্তু ভালবাসতে পারাই যথেষ্ট। আমি শুধু ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছি যেন আমার এই সৌভাগ্য-টুকু অক্ষুণ্ণ থাকে। কখনো দয়াময়কে জানাইনি যে সেও যেন আমার প্রতিদান দেয়। ভালবাসা—সেটুকুই আসল জিনিষ। প্রতিদান না পেলেও ক্ষতি নেই।

—তাই বুঝি তুমি আমায় কখনো সে সব কথা খুলে বলনি? আমার স্বপ্ন ভেঙ্গে দিতে চাও নি?

—হ্যাঁ, সেটাই একমাত্র কারণ। আমি ত দেখেছি তোমার মন

কেমন করে জল পেয়ে আস্তে আস্তে চারা থেকে ফুলে ফুলে ভরা গাছ হয়ে দাঁড়াল। তোমার ব্যক্তিত্ব, মনুষ্যত্ব বিকশিত হয়ে উঠল। তাকে বাধা দেবার, ঠেকিয়ে রাখবার চেষ্টা করাও পাপ। যে জিনিষ আমার অন্তরকে দহন করেছে, তা তোমায় করে তুলল উজ্জ্বল। সে আলোকে চেপে রাখব, নিভিয়ে দোব—কোন্ অধিকারে, দেবল ?

বলতে বলতে মিতার স্বর প্রায় ফিস ফিসানিতে এসে দাঁড়াল। প্রায় শোনা যায় না। দেবলের হাত ঘড়িটার টিক টিক পর্য্যন্ত তার চেয়ে বেশী জোরে শোনা যাচ্ছে।

দেবলের কাণ সে দিকে গেল। সে তাড়াতাড়ি সেটা খুলে ফেলতে গেল। মিতা বুঝতে পারল। অমনি বাধা দিল,—না, থাক থাক। ওটা তোমারই হাতে থাকুক। মনে করিয়ে দেবে আমার কথা—ওগো ভাল থেকে সুস্থ থেকে ফিরে এসো তুমি। তুমি নিজের দিকে তাহলে নজর রাখবে। ইচ্ছা করে অনর্থক বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়বে না। কথা দাও, কথা দাও দেবল। আমার দিব্যি।

আচ্ছা, কথা দিলাম, মিতা। কিন্তু কথা দিলেই যে তা রাখতে পারব তার ঠিক কি? এই লড়াইয়ে আমরা ত শুধু মেশিনের সামনে দাঁড় করান পুতুল। কিন্তু তুমিও কথা দাও যে এই ফ্রণ্ট থেকে এখন পিছনে চলে যাবার চেষ্টা করবে? যাকে তুমি ভালবাস অন্ততঃ তার জন্যেও ত' তোমায় নিরাপদে থাকতে হবে। তা হলে হয়ত একদিন তুমি তাকে পেতেও পার।

ম্লানভাবে মিতা বলল—তা হয় না দেবল। আমি বিশেষজ্ঞ স্পেশালিষ্ট ট্রেনিং নিয়েছি; এই সব যন্ত্র চালাবার জন্য। সেজন্যই ফরোয়ার্ড এরিয়াতে আগুয়ান এলাকায় আমায় আসতে দিয়েছে। অন্য ওয়াক-আই যারা এসেছে তারা যদি ফিরতে চায় তাদের ফিরে

যেতে দেবে। কিন্তু আমার কোন অজুহাতে ফিরবার পথ নেই। তোমরা না হটে যাওয়া পর্য্যন্ত সে কথাই উঠে না। কিন্তু তোমরা হেরে যাও তাই বা প্রার্থনা করব কোন্ প্রাণে?

আওয়াজ ধরবার যে যন্ত্রটার চাবি মিতা খুলে রেখেছিল তাতে শব্দ উঠতে লাগল।

দুষমণ, মেমসাব, দুষমণ মেরা হাত্‌পাও বাঁধকে পাকড় রাখথা হ্যায়। দুষমণ। হুঁশিয়ার।

ওইরে। হাবিলদার ব্যাটা মুখের বাঁধন খুলে ফেলেছে। যাই ওকে বন্দুকের এক কুঁদোর ঘায়ে অজ্ঞান করে আসি।

বলতে বলতেই ছুটতে সুরু করল দেবল। মিতা লাফিয়ে ওর সামনে এসে পথ আটকাল, বলল—খবরদার, ভুল করো না। ও তোমায় চিনে রাখবে। আর সবাই জানবে যে তুমি এখনো কাছাকাছি কোথাও লুকিয়ে আছ। আধঘণ্টাও হয়ে এল। শিগগির, পালাও শিগগির। আর দেরী নয়।

সঙ্গে সঙ্গে ওর পকেটে কিছু খাবারের প্যাকেট গুঁজে দিল। আর একটী জলের বোতল। ভগবান তোমার ভাল করুন, দেবল। মঙ্গলে রাখুন! আমার কথার মান রেখো। যাও, যাও, এখখুনি।

নিজে হাতে দেবলকে মিতা অন্ধকারে ঠেলে দিল। সেই অন্ধকার, যাকে হাত দিয়ে ছোঁয়া যায় না, যায় না দেখা চোখ দিয়ে। শুধু সারা মন জুড়ে রাখে, ঢেকে দেয় সারা জীবন। সেই অন্ধকারের মধ্যে একা পিছনে পড়ে রইল মিতা।

আর রইল তার চোখের জল।···মনের কান্না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

(পূর্বানুবৃত্তি)

২২

আমার পাঠ্যাবস্থায় আমরা ভবানীপুরে বাস করতাম। যতদূর মনে পড়ে ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ৺লালমোহন গঙ্গোপাধ্যায় পূর্ণিয়ার দেওয়ানি আদালতে ওকালতি করতে করতে কলিকাতা হাইকোর্টে যোগদান করেন।

উকিল পাড়া বলে তখন ভবানীপুরের খুব প্রসিদ্ধি। এ প্রসিদ্ধি কি ক'রে গড়ে উঠেছিল বলা কঠিন। কিন্তু কলিকাতা হাইকোর্টের অধিকাংশ উকিল ভবানীপুরে বাস করতেন। যাঁদের পৈতৃক গৃহ ভবানীপুরে ছিল তাঁদের ত কথাই নেই, বাহিরের লোক যাঁরা কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি করতে আসতেন তাঁরা পারতপক্ষে ভবানীপুরে বাসা পেলে অন্যত্র যেতেন না। তীর্থক্ষেত্রে প্রধান দেবতার মন্দিরের আশে-পাশে কাছাকাছি সামন্ত দেবতারা মন্দির পেতে বাস করেন; তাই তাঁদের ভাগ্যে উদ্বৃত্ত পুষ্প-চন্দন-চাল-কলার উপচিতি সুলভ হয়। রাম সীতার পৃষ্ঠপোষকতা যদি না থাকে তা হ'লে কেবলমাত্র হনুমানকে অবলম্বন ক'রে একটা তীর্থ গড়ে ওঠা কঠিন। সেই কারণে ভবানীপুরের হোমরা-চোমরা উকিলদের

বাড়ির কাছাকাছি নূতন ছোট ছোট উকিলরা বাসা বাঁধতেন, যাতে বড় বড় উকিলদের দ্বারা আকৃষ্ট মক্কেলদের ছোট ছোট কাজ-কর্ম লাভ ক'রে তাঁরা বড় হ'তে পারেন। কুণ্ডগার প্রসিদ্ধ মুখুজ্যে বংশের ৺করুণা-নিধান মুখোপাধ্যায় তদানীন্তন কলিকাতা হাইকোর্টের এমনি একজন বড় উকিল। তাঁর জুনিয়ার রূপে দাদা ভবানীপুরে বাসা নিয়ে ওকালতি আরম্ভ করলেন।

ভবানীপুর তখন শীর্ণগলি ও অপ্রশস্ত রাজপথে আকীর্ণ অপরিচ্ছন্ন উপনগর। তার উত্তর সীমান্তে কলিকাতার পরিচ্ছন্নতম অঞ্চল চৌরঙ্গী, এবং দক্ষিণ উপান্তে ভবানীপুর হ'তেও অপরিচ্ছন্ন কালীঘাট। উত্তরে গড়ের মাঠে ভারতবর্ষের অভিজাততম গির্জা সেণ্ট পলস্ ক্যাথিড্রাল, দক্ষিণে কালীঘাটে অন্যতম সিদ্ধপীঠ কালিকা মন্দির, এবং মাঝখান ভবানীপুরে পদ্মপুকুর রোডে উভয়ের মধ্যস্থতা ব্রাহ্মমন্দির।

ভবানীপুরের প্রধানতম এবং দীর্ঘতম রাজপথ রসা রোড তখন এত সঙ্কীর্ণ যে, পুব পটিতে অতি-অপ্রশস্ত ফুটপাথ রেখে এবং অব্যবহিত পার্শ্বে ট্রামের ডবল লাইন স্থাপন ক'রে পশ্চিম পটিতে ফুটপাথ রচনার ভূমি পাওয়া যায় নি। অথচ কালীঘাটের কালী মন্দির এবং টালিগঞ্জের টারফ্ ক্লাবের কল্যাণে ঐ শীর্ণ পথে ট্রাম এবং অপরাপর যানবাহনের এত ভীড় যে, পথের পশ্চিমধারের পথচারীদের গাড়ি-ঘোড়ার আঘাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য সময়ে সময়ে পথ-পার্শ্ববর্তী দোকান ঘরে উঠে দাঁড়াতে হ'ত।

তখনও ভবানীপুরে ভূগর্ভ নর্দমার ব্যবস্থা হয় নি। পথের উভয় পার্শ্বস্থ খোলা কাঁচা ড্রেনের দূষিত বায়ুর ফুট-মারা কালো দধির থকথকানির পূতিগন্ধকে স্বীকার ক'রে নিয়ে আমরা সেখানে সুখে দুঃখে বাস করতাম। এখন কিন্তু সেই বিগত দিনের কৈশোর ও যৌবনকালের

ভবানীপুরের স্মৃতির মধ্যে জুঁই ফুলের সৌরভ। সময়ের দূরত্ব এক সময়ের কাককে অন্য সময়ের কোকিলে রূপান্তরিত করে।

রসা রোডের সঙ্কীর্ণতার অসুবিধা উপলব্ধি ক'রে রসা রোডের পূর্ব ও পশ্চিম উভয় দিকে রসা রোডের সমান্তরালে দুটি নূতন রাজপথ নির্মিত হয়েছিল, ল্যান্সডাউন রোড ও হরিশ মুখার্জি রোড। উভয় পথের অতি-প্রশস্ততা দেখে আমাদের সেদিন কলিকাতা পৌর সংসদের কর্তৃপক্ষের পক্ষে তা বাড়াবাড়ি মনে হয়েছিল। আজ ঐ দুটি পথের অতিবর্ধিত চলাচলের (traffic) পরিপ্রেক্ষিতে পথ দুটি সঙ্কীর্ণ হয়ে গেছে; মনে হয় পথ-নির্মাণের সময়ে পথের প্রস্থ কতটা করা কর্তব্য তদ্বিষয়ে সেদিনের পৌর কর্তৃপক্ষের যথার্থ দূরদৃষ্টির অভাব ছিল।

তখনকার দিনে ভবানীপুরে অনেকগুলি খ্যাতনামা ডাক্তার এবং কবিরাজ ছিলেন। তন্মধ্যে দুইজন প্রখ্যাত ডাক্তার, বিহারীলাল বসু ও গিরিশচন্দ্র দে, আমাদের গৃহ-চিকিৎসক ছিলেন। গিরিশচন্দ্র অপেক্ষা বিহারীলাল প্রাচীন অর্থাৎ সিনীয়র ছিলেন।

দুজনেই শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক, কিন্তু উভয়ের প্রকৃতি এবং পদ্ধতি ছিল সম্পূর্ণ পৃথক। প্রকৃতির দিক দিয়ে গিরিশবাবু ছিলেন একেবারে সন্ত্রাসবাদী না হলেও, ত্রাসবাদী (alarmist); আর বিহারীবাবু ছিলেন কুছ-পরোয়া-নেইবাদী। রোগীর ঘরে গিরিশবাবু ঢুকতেন উদ্বিগ্ন মুখে অতি সন্তর্পণে জুতার মৃদুতম খুট্ খুট্ শব্দ করতে করতে; তারপর চেয়ারটা উঁচু করে তুলে ধ'রে নিঃশব্দে সুবিধা মতো পেতে ব'সে রোগীর নাড়ী টিপে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে শুশ্রূষাকারীর দিকে চাইতেন। শুশ্রূষাকারী একে একে রোগের বিবরণ দিয়ে যেতেন, গিরিশবাবু শুষ্কমুখে চাপা গলায় 'ঈশ্! তাই তো!···তারপর?' বলতে থাকতেন, আর রোগীর ধাপে ধাপে নিঃশ্বাস চেপে আসবার জোগাড় হ'ত। সুচিকিৎসার

গুণে রোগী শেষ পর্য্যন্ত সেরে উঠত বটে, কিন্তু রোগ-বিভীষিকায় বেশ খানিকটা নাকানি-চোবানি খাওয়ার পর।

বিহারীবাবু কিন্তু খুট্-খুটের ধার দিয়েও যেতেন না। খট্ খট্ শব্দে রোগীর ঘরে প্রবেশ করে উচ্চৈঃস্বরে প্রশ্ন করতেন, "কি হয়েছে ?" তারপর চেয়ারটা হড়াৎ ক'রে সরিয়ে নিয়ে রোগীর পাশে ব'সে নাড়ী টিপে ধরে বলতেন, "ও! টাকা হয়েছে! টাকা হয়েছে! তাই এই সামান্য রোগে ডাক্তার ডাকা!" শুনে রোগীর মন চাঙ্গা হ'য়ে উঠত।

প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন লেখার পর তরুণ রোগীকে সম্বোধন ক'রে বিহারী ডাক্তার বলতেন, "শিশি দুয়েক ওষুধ খাওয়ার পর খুব মত্তে খানিকটা সরষের তেল সর্ব্বাঙ্গে বেশ ক'রে ঘষে গঙ্গাচান করে এসো। শরীর হাল্কা হ'য়ে যাবে।"

শুনে রোগীর মন রোগ-শয্যাতেই চিন্তাস্নান করে হাল্‌কা হত। ডাক্তারখানা থেকে প্রেস্‌ক্রিপ্‌শনের ওষুধ আসবার আগেই রোগী ডাক্তারের আশ্বাসের ঔষধ সেবন করতে আরম্ভ করত।

বস্তুত, বহু চিকিৎসক শুধু রোগের চিকিৎসাই করেন, রোগীর চিকিৎসা করেন না। শাস্ত্রীয় মিক্সচার মলম ফোঁড়া-ফুঁড়ির চক্‌মকানিতে তাঁরা রোগীকে হারান। বেনেপাড়ার সন্তোষকুমার ঘোষ পরিণত হন তাঁদের প্রেসক্রিপ্‌শনের মাত্র এস, কে, ঘোষে।

এই মিক্সচার মলম ফোঁড়া-ফুঁড়ি সম্বন্ধে ইংলণ্ডের একজন বিখ্যাত রাজ চিকিৎসকের (Royal Physician) একটি প্রসিদ্ধ উক্তি আছে। উক্তিটি প্রশ্ন এবং উত্তরের আকারে। চিকিৎসক নিজেই প্রশ্ন করেছেন, এবং নিজেই সে প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। উক্তিটি এইরূপ,—If the whole British Pharmacopœia is thrown down into the bottom of the sea, what would happen?—It

would be a boon to the humankind, and a catastrophe to the fishkind. যদি সমস্ত ব্রিটিশ চিকিৎসা শাস্ত্র মায় ঔষধপত্র সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করা যায়, তা হ'লে কি হয়? তাহ'লে সেটা হয় মানব জাতির পক্ষে একটা বর, এবং মৎস্যকুলের পক্ষে এক বিপৎপাত। অর্থাৎ ঔষধ-পত্রের হাত থেকে পরিত্রাণ লাভ করে মানুষেরা যাবে বেঁচে, আর সেইগুলিতে পারদর্শী হয়ে ব্যবহার ক'রে মৎস্যকুল যাবে মারা। ইংলণ্ডের আর একজন প্রখ্যাত চিকিৎসক বলেছেন, Every dose of drug takes away some portion of our vitality.

এই শ্রেণীর উক্তি আর-একদিকের পাল্লার উগ্র অত্যুক্তি তদ্বিষয়ে সন্দেহ নেই, কিন্তু এগুলির মধ্যে খানিকটা সত্য যে আছে সে কথাও অস্বীকার করা যায় না। আমাদের বাঙলাদেশের প্রবাদ 'যা-ও ছিল র'য়ে বসে, তা-ও গেল বদ্যি এসে' সাগরপারের উক্তিরই প্রতিধ্বনি। চিকিৎসা দু-ফলা করাত, যা রোগেরও গলা কাটতে পারে, রোগীরও গলা কাটতে পারে।

বস্তুত, বিচক্ষণ চিকিৎসক হচ্ছেন তিনি, যিনি রোগের চিকিৎসা করেন, রোগীরও চিকিৎসা করেন; যিনি রোগীর দেহের দিকে অত্যধিক দৃষ্টি দিতে গিয়ে রোগীর মনের প্রতি দৃষ্টি হারান না: যিনি দুইশত রক্তচাপের রোগীকে নিরবচ্ছিন্ন দুবহ বিশ্রামের শয্যায় শুইয়ে রেখে মস্তকের মধ্যে রোগ-দুশ্চিন্তার কারখানা খুলে দিয়ে দুইশত রক্তচাপকে দুইশত চল্লিশে ঠেলে নিয়ে যান না; যিনি রক্তচাপের রোগীকে বলেন, উপস্থিত চাপে আপনার পরাশর সংহিতা নিয়ে মৌলিক গবেষণা চলবে না, কিন্তু লঘু সাহিত্য নিয়ে অবসর-বিনোদন চলবে।

গিরিশ ডাক্তারের এলাকা ছিল বিটিশ ফার্মাকোপিয়ার চতুঃসীমার মধ্যে নিবদ্ধ। তার বাইরে এক ইঞ্চিও তিনি পদার্পণ করতেন না।

ব্রিটিশ ফার্মাকোপিয়ার এলাকার মধ্যে থেকেই তিনি সুচারুরূপে চিকিৎসা করতেন এবং রোগ সারাতেন।

বিহারী ডাক্তারের কিন্তু নিজের অধীত-শাস্ত্রের প্রতি গিরিশ ডাক্তারের ন্যায় তেমন অনন্যনিষ্ঠতা ছিল না। অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসায় এল-এম্-এস্ হ'য়েও তিনি সুবিধা মতো হোমিওপ্যাথিক, এমন কি, জড়ি-বুটি টোটকা-টুটকিরও আশ্রয় গ্রহণ করতে দ্বিধাবোধ করতেন না। অপর পক্ষে গিরিশবাবু অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসার সহিত টোট্কা টুটকির যে-কোনো প্রকার সহযোগিতা অপছন্দ করতেন। এই প্রসঙ্গে আমাদের বাড়িতে গিরিশবাবুর সামান্য একটু কারচুপিতে বিহারীবাবুকে একদিন বেশ একটু বিব্রত হ'তে হয়েছিল। গল্পটা বলি।

বহুকাল আগেকার কথা।

তখন কলিকাতা ভারতবর্ষের রাজধানী। গ্রীষ্মকালে কলিকাতার প্রখর তাপ থেকে আত্মরক্ষার জন্য তখনকার বড়লাটরা (Viceroy and Governor-General) অফিস-দপ্তরসহ পাঞ্জাবের শিমলা শৈলে কয়েকমাস বাস করতেন। হেমন্তের শেষে তাঁরা সদলবলে অর্থাৎ তাঁদের আই-সি-এস্ ইংরাজ মেম্বার ও সেক্রেটারিগণের দ্বারা পরিবৃত হ'য়ে দেশীয় অফিসার, পাঁচ-ছয় শত কেরাণী, মায় দফ্তরি-আরদালি-জমাদার সহ কলিকাতায় নেমে আসতেন; তারপর সমস্ত শীত ঋতু কলিকাতায় অতিবাহিত ক'রে বিশ্ববিখ্যাত কলিকাতা টার্ফ ক্লাবের কয়েকমাস ব্যাপী ঘোড়দৌড়ের আনন্দ-উদ্দীপনা এবং শৈলদুর্লভ অপরাপর প্রমোদ-অনুষ্ঠান উপভোগের পর বসন্তের মাঝামাঝি পুনরায় সদলবলে শিমলার শৈলাবাসে প্রস্থান করতেন।

বহু পূর্বের এই কলিকাতা-শিমলা-গমনাগমনশীল ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্টের হোম ডিপার্টমেণ্টে আমার মেজদাদা ৺রমণীমোহন গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন

একজন উচ্চ কর্মচারী। এক বৎসর শিমলা হ'তে হৈমন্ত অবতরণের কিছু পূর্বে তিনি সাংঘাতিক এক স্ফোটক-রোগে আক্রান্ত হন, এবং অবিলম্বে তৎকালীন প্রখ্যাত অস্ত্রবিৎ মেজর গ্রীণকে অস্ত্রোপচার করতে হয়। কিছুদিন পূর্বে কাবুলের আমীরকে বিপজ্জনক অস্ত্রোপচারের দ্বারা সুস্থ ক'রে মেজর গ্রীণ এসিয়া জোড়া খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

অস্ত্রোপচার ভালই হয়েছিল, কিন্তু হৈমন্ত অবতরণের দ্বারা নির্জন-হয়ে-আসা পর্বতে মেজদাদাকে রাখা কয়েকটা কারণে অসুবিধাজনক হ'তে পারে মনে করে তাঁকে কলকাতায় নিয়ে আসা হ'ল।

কলকাতায় এসে তিনি বিহারীবাবু ও গিরিশবাবুর যুগ্ম-চিকিৎসাধীনে রইলেন। কয়েকদিন পরে ফোড়ার প্রদাহ পুনরায় বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রসিদ্ধ অস্ত্র-চিকিৎসক ৺সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্যকে দিয়ে দ্বিতীয়বার অস্ত্রোপচার করা হ'ল। তাতেও কিন্তু বিশেষ সুবিধা হ'ল না। দুই-একদিন যন্ত্রণা কিছু কম থেকে পুনরায় বৃদ্ধি পেতে লাগল।

তখন বিহারীবাবু অগত্যা ডাক্তারী চিকিৎসার সহিত অশাস্ত্রীয় চিকিৎসার সহযোগিতা গ্রহণ করতে মনস্থ করলেন। একটা কোন্ গাছের পাতা দিয়ে ক্ষতটা আচ্ছাদিত ক'রে বেঁধে রাখতে হবে।

সভয়ে গিরিশবাবু প্রশ্ন করলেন, "খোলা ঘায়ের ওপর; না, কিছু একটা চাপা দিয়ে তার ওপর?"

চক্ষু কুঞ্চিত ক'রে বিহারীবাবু বললেন, "আরে, না মশায়, কিছু চাপা দিয়ে নয়; খোলা ঘায়ের ওপর। যার কাছ থেকে আপনি উপকার পেতে চান তাকে একটা আবরণ দিয়ে দূরে রাখলে উপকার পাবেন কি ক'রে?"

গিরিশবাবু বললেন, "কিন্তু কাঁচা পাতা,—কোনো রকমে সেপ্‌টিক যাতে না হ'তে পারে—"

গিরিশবাবুকে কথা শেষ করবার অবসর না দিয়ে বিহারীবাবু হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, "আপনাদের আধুনিক ডাক্তারদের সেপ্‌টিকের বিভীষিকা দেখা একটা ফ্যাশন হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। এই যে এতদিন অ্যান্টি-সেপ্‌টিক ড্রেসিং চলছে তাতে কোনো ফল পাওয়া গেছে কি?"

এ কথার বিরুদ্ধে যথেষ্ট যুক্তি দেখানো যেতে পারত কিন্তু গিরিশবাবু বছর আট-দশের জুনিয়ার, সুতরাং পাতা বাঁধতেই হ'ল। কিন্তু মনের মধ্যে একটা ক্ষোভ রয়ে গেল, যেটা উপশমিত হবার সুযোগ পেয়েছিল দিন তিনেক পরে।

তিনদিন প্রত্যহ দুবার করে বদলে বদলে পাতা বাঁধা হ'ল; কিন্তু উপকার ত কিছু হলই না, উপরন্তু যন্ত্রণা এত বেড়ে গেল যে, ডাক্তাররা মনে করলেন সঞ্চিত পূযের নির্গমের দ্বারা যন্ত্রণা উপশমের জন্য তৃতীয়বার অস্ত্রোপচার করা হয়ত' অনিবার্য হয়েছে। এ বিষয়ে সিদ্ধান্তের জন্য তাঁরা কলিকাতার শ্রেষ্ঠ অস্ত্রচিকিৎসক মেজর বার্ডের পরামর্শ গ্রহণ করা স্থির করলেন এবং এ কথাও স্থির করলেন যে, মেজর বার্ড যদি অস্ত্রোপচারের পরামর্শ দেন, তা হ'লে তাঁর দ্বারাই অপারেশন করা হবে। বিহারীবাবু মেজর বার্ডকে চিঠি দিলেন; মেজর বার্ড উত্তর দিয়ে জানালেন যে, পরদিন সকাল সাড়ে নটায় তিনি রোগী দেখবেন।

পরদিন সকাল সওয়া ন'টা আন্দাজ বিহারীবাবু আমাদের গৃহে উপস্থিত হলেন। রোগীর কাছে উপস্থিত হ'য়ে তিনি দেখলেন ইতিপূর্বেই উপস্থিত হ'য়ে গিরিশবাবু রোগীর শয্যাপার্শ্বে বসে গল্প করছেন।

ব্যগ্রকণ্ঠে বিহারীবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "পাতাগুলো ঘুচিয়েছেন ত?"

ব্রিটিশ ফারমাকোপিয়ার উপর অশোধিত দেশি গাছ-গাছড়ার হস্তক্ষেপ ইংরাজ চিকিৎসক পছন্দ করবেন না, তদ্বিষয়ে বিহারীবাবুর আশঙ্কা এবং গিরিশবাবুর প্রতীতি ছিল।

নিরীহভাবে গিরিশবাবু বললেন, "আজ্ঞে না, আপনার জন্য অপেক্ষা করছিলাম।"

ভ্রূ কুঞ্চিত ক'রে বিরক্তস্বরে বিহারীবাবু বললেন, "কি আশ্চর্য! আমার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন! শীগগীর ওগুলো ঘুচিয়ে সরিয়ে দিন! সায়েব এসে কি দেখবেন? পাতা? না, ফোড়া?"

গিরিশবাবু বোধহয় মনে মনে বলেছিলেন, দুই-ই; ধীরে ধীরে তিনি ব্যাণ্ডেজ মোচন কার্য আরম্ভ করলেন।

বুক পকেট থেকে ঘড়ি বার করে দেখে বিহারীবাবু দ্রুতপদে নিচে ছুটলেন। সাড়ে ন'টার বেশি দেবি নেই।

মিনিট পাঁচ-সাত পরে বার্ড সাহেবের গাড়ি এসে আমাদের বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াল।

ব্যস্ত হ'য়ে বিহারীবাবু এগিয়ে গেলেন,—Good morning Sir!

গাড়ি হ'তে অবতরণ ক'রে বিহারীবাবুর করমর্দ্দন ক'রে মেজর বার্ড বললেন, "Good morning Bihari Babu, How do you do? Extremly cold to-day. Is'nt it?"

বিহারীবাবু বললেন, "Yes Sir, extremly cold!"

ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহ। সে দিন সত্যই অতিশয় কনকনে ঠাণ্ডা ছিল।

বার্ড সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে রোগীর কক্ষে প্রবেশ ক'রে বিরক্তি ও বিমূঢ়তায় বিহারীবাবু রুষ্ট হ'য়ে উঠলেন। রোগীর পাশে একটা টুলের উপর একরাশ ব্যাণ্ডেজমুক্ত পাতা, আর রোগার ক্ষতর উপরও দু-চারটা পাতা লেগে থেকে সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, টুলের পাতাগুলোও কিছু পূর্বে ক্ষতর উপরই ছিল। অনাবশ্যক সন্তর্পণে গিরিশবাবু অনপসারিত পাতাগুলি ছাড়াবার কার্যে রত।

তিক্ত কণ্ঠে বিহারীবাবু বললেন, "কি আশ্চর্য! এগুলো এখনও ঘোচান নি?"

উত্তর দেওয়ার সময় পাওয়া গেল না, উৎসুক কণ্ঠে মেজর বার্ড জিজ্ঞাসা করলেন, "What are these leaves?"

অমায়িক মৃদু কণ্ঠে গিরিশবাবু বললেন, "Dr. Bose says these leaves have got great medicinal property to extract pus from obstinate boils." তারপর বিহারীবাবুর দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে বিনীতস্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, "Am I not correct Dr. Bose?"

বার্ড সাহেব বিচক্ষণ সহৃদয় ব্যক্তি, বিহারীবাবুর নিকট হ'তে তিনি 'কল' পেয়েছেন। বিহারীবাবুর মুখে-চক্ষে ক্ষুব্ধ বিমূঢ়তার ছায়া হয়ত' দেখতে পেয়েছিলেন, প্রসঙ্গটা পরিত্যাগ করে রোগীর প্রতি মনোযোগী হলেন।

বিহারীবাবুর মুখের ভাব লক্ষ্য ক'রে আমরা কিন্তু সত্যই ব্যথিত হয়েছিলাম।

Doctors differ—সে কথা জানি; তার দৃষ্টান্তও অনেক দেখেছি। কিন্তু সে differenceএর এমন করুণ পরিণতি আর কোনোদিন দেখিনি।

[ক্রমশঃ]

—"সাহিত্যের সমালোচনা বা সমীক্ষণের নামে আমরা অনেক সময় এমন অনেক তত্ত্বে আসিয়া পৌঁছাই যেখানে সাহিত্যের রাজ্য পার হইয়া কখন যে আমরা আসিয়া নিছক তত্ত্বের রাজ্যে পৌঁছিয়াছি, আমরা নিজেরাই সে কথা জানিতে পারি না।"

—রবীন্দ্রনাথ

অজ্ঞাতবাসে শ্রীঅরবিন্দ

শ্রীমতিলাল রায়

একদিন প্রাতঃকালে, মাঘ মাসের শেষাশেষি হইবে, কর্ম্মস্থানে বাহির হইতেছি এমন সময়ে ৺শ্রীশচন্দ্র ঘোষ আমায় আড়ালে ডাকিয়া বলিলেন—শুনেছ, এক কাণ্ড হইয়া গিয়াছে। আমি সবিস্ময়ে তাঁহার মুখের দিকে চাহিলাম। তখন কাণ্ড অর্থে বৈপ্লবিক ভয়ঙ্কর কোন ব্যাপার ভিন্ন অন্য কিছু ছিল না। তাহা ব্যতীত সম্প্রতি কলিকাতার উচ্চ আদালতের সামশুল হুদা নামক জনৈক উচ্চশ্রেণীর কর্ম্মচারী নিহত হইয়াছেন। আবার যে কি কাণ্ড বাধিল জানিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইলাম। বন্ধু বলিলেন—"অরবিন্দবাবু চন্দননগরে আসিয়াছিলেন এতক্ষণ হয়ত চলিয়া গিয়াছেন—বড় খারাপ হইল।" আমি রহস্য বুঝিলাম না, ভাবিলাম—কোন উদ্দেশ্য লইয়া তিনি হয়ত আসিয়া থাকিবেন, পুনরায় চলিয়া যাওয়ায় মন্দ হইবার কারণ কি? কিন্তু শ্রীশচন্দ্র এক নিঃশ্বাসে যাহা বলিলেন তাহাতে বুঝিলাম যে, অরবিন্দবাবু কলিকাতা হইতে পলাইয়া আসিয়াছিলেন; তিনি যাঁহার আশ্রয় প্রার্থনা করিয়াছিলেন তিনি তাহাতে সম্মত না হওয়ায় হয়ত ফিরিয়া গিয়া থাকিবেন।

শুনিলাম—ভোর চারটায় শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার পরিচিত ক্ষেত্রে সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন, এখন প্রায় সাড়ে ছয়টা বাজিয়া গিয়াছে। আমার সহিত অরবিন্দের কোনরূপ সাক্ষাৎ-পরিচয় ছিল না—তাঁহার নাম শুনিয়াছিলাম মাত্র, এবং হুগলীর প্রাদেশিক সভায় তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। আলিপুর বোমার মকদ্দমার সময়ে তাঁর কথা হৃদয়ের দরদ দিয়া শুনিতাম ও পড়িতাম। ইংরাজী "বন্দেমাতরম্" কাগজে তাঁহার লেখা বাহির

হইত, এইজন্য আগ্রহ সহকারে উহার গ্রাহক হইয়াছিলাম। অরবিন্দের ত্যাগ ও তপস্যার কথা সর্ব্বজনবিদিত। তদুপরি আলিপুর জেল হইতে ফিরিয়া তিনি যে সকল বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাহা রাষ্ট্রনীতি ক্ষেত্রে অভিনব বস্তু ছিল। ভারতের প্রাণের কথা যেন তার কণ্ঠে ঝঙ্কার তুলিত। বিশেষতঃ মকদ্দমার জেরায় প্রকাশিত তাঁর পত্নী মৃণালিনীদেবীকে লিখিত পত্রগুলিতে যে বিশুদ্ধ স্বদেশ প্রেমের যে অমৃতধারা বহিয়াছিল, তাহাও আমার হৃদয়কে অভিষিক্ত করিয়াছিল। দেশকে এমন করিয়া কেহ বুঝি ভালবাসিতে পারে না! দেশের মুক্তি এই মহাপুরুষের তপস্যার বলেই যে আসিবে, এ ধারণাও বদ্ধমূল হইয়াছিল। সে অনেক কথা—উপস্থিত তাঁর খ্যাতি ও প্রতিপত্তির আলোচনা ছাড়িয়া আসল কথাতেই ফিরি।

আমি বলিলাম—"এতক্ষণ যে তিনি থাকিবেন তাহা মনে হয় না। তবে তিনি কি ভাবে আসিয়াছিলেন?" বন্ধুর মুখেই শুনিলাম যে, নৌকা করিয়া তিনি আসিয়াছিলেন, একজন যুবকের মারফৎ তিনি সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন—কিন্তু যাঁহাকে সংবাদ দিয়াছিলেন তিনি তাঁহাকে আশ্রয় দিতে ভরসা না করায় পুনঃ প্রস্থান করেন। বন্ধু প্রতিদিন ঐ ভদ্রলোকের বাড়ীতে চা খাইতে যাইতেন। সেদিন ভোরে তাঁর বাড়ীতে চা খাইতে গিয়া তিনি ঐ কথা শুনিয়াছেন—তাই তাড়াতাড়ি আসিয়া আমায় উহা জানাইলেন। আমি তাঁহার কথা শুনিয়া অন্তরের আবেগে তৎক্ষণাৎ গঙ্গার ধারে গিয়া উপস্থিত হইলাম। বসন্তের প্রথম পদ-সঞ্চারে শীতের কুহেলিকা তখন কাটিয়া গিয়াছে। ভাগীরথীর ক্ষীণ ধারা প্রভাত-সমীরে দুলিয়া দুলিয়া নৃত্য করিতেছে। তখনও পূর্ব্বগগনে মেঘ-মালা বিদীর্ণ করিয়া সূর্য্য প্রকাশ হয় নাই। আমি অরবিন্দের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করিলাম। আমি অশ্বত্থ-বটবৃক্ষ শোভিত তীরভূমি

দিয়া দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইলাম। শ্রীঅরবিন্দ হয়ত এখনও থাকিলেও থাকিতে পারেন—এই আশায় চলিলাম। স্নানার্থীরা সবিস্ময়ে আমার দিকে তাকাইল—এইভাবে কোথায় ছুটিয়া চলিয়াছি, এই মর্ম্মে আমার পরিচিত বন্ধুদের মনে হয়ত কৌতূহলও জাগিয়াছে, কিন্তু আমার তখন কাহারও দিকে দৃষ্টি দিবার অবসর ছিল না। একটা মহাকর্ষণই যেন আমায় তখন ছুটাইয়া লইয়া যাইতেছিল।

ষ্ট্রাণ্ড আরম্ভ হইয়াছে রাণীর ঘাট হইতে। দেখিলাম—সেই ঘাটে একখানি পান্‌সি তরঙ্গ হিল্লোলে নৃত্য করিতেছে। পাল গুটাইয়া রাখা হইয়াছে, তবুও বাতাসে তার খানিকটা উড়িতেছে—উহা যেন পতাকার শোভার মত মনে হইল। একজন যুবক নৌকার ছইয়ের উপর বসিয়া আছে। এই নৌকা করিয়াই শ্রীঅরবিন্দ আসিয়া থাকিবেন—এই কথা আমার মনে হইল। সেই যুবকটি আমায় দেখিয়া কোন কথা বলিল না। আমি তখন একটু আগাইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম: "আপনারা কি কলিকাতা হইতে আসিতেছেন?" যুবক তাড়াতাড়ি বলিল: "হাঁ, কেন বলুন দেখি?" আমি সাহসে বুক বাঁধিয়া বলিলাম: "এই নৌকায় কি অরবিন্দবাবু আছেন?" যুবক আমায় কাছে ডাকিয়া বলিল: "নৌকায় আসুন।"

আমি একলম্ফে নৌকার উপর উঠিয়া পড়িলাম। যুবক আমায় ভিতরে লইয়া যাইলে দেখিলাম—অন্য এক তরুণের কোলে মাথা রাখিয়া চুচুড়া প্রাদেশিক সভায় যে মূর্ত্তি দেখিয়াছিলাম সেই বাঞ্ছিত মূর্ত্তি শ্রীঅরবিন্দ শুইয়া আছেন। তিনি আমায় কাছে ডাকিয়া বলিলেন: "আপনি আমার খবর পাইলেন কোথা হইতে?" আমি যাহা শুনিয়াছিলাম সব বলিলাম। তিনি শুনিয়া শুধু বলিলেন: "আমায় আশ্রয় দেওয়া কি সুবিধা হইবে?" গর্ব্বে আমার বুক দুরু দুরু করিতে লাগিল। মনে

হইল—সে কি? আপনাকে আশ্রয় দেওয়ার সুবিধা? প্রাণ চাহিলে প্রাণ দিতে পারি। আবেগোদ্বেল জীবন সেদিন। মুখে মুখে জানাইলাম: "আপনাকে লইতেই তো আসিয়াছি।" তিনি আমার দিকে মর্ম্ম-ভেদী দৃষ্টি রাখিয়া বলিলেন: "কতদূর আপনার বাড়ী?" —"কিছু দূরে! আপনাকে কিছু ভাবিতে হইবে না—আমি সব ব্যবস্থা করিতেছি।"

আমি মাঝিকে নৌকার নোঙর উঠাইতে বলিলাম। বাতাস বহিতেছিল দক্ষিণ দিক হইতে, আমার গতিও তখন উত্তর দিকে। দাঁড় টানিয়া যে স্থানে আশ্রমের ঘাট, তাহা হইতে দূরে নৌকা ভিড়াইলাম। তখন সে স্থানে শ্মশান ছিল, সেই শ্মশানের ঘাটেই নৌকা ভিড়ান হইল। এখন যেখানে প্রবর্ত্তক আশ্রম, তাহারই উপর দিয়া শ্রীঅরবিন্দকে লইয়া আমাদের বৈঠকখানায় উপস্থিত হইলাম। আরাম কেদারায় বসাইয়া কথঞ্চিত নিশ্চিন্ত হইলাম।

আমি আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম যে, যে-দুইজন তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছিলেন শ্রীঅরবিন্দের ভার আমারই উপর দিয়া তাঁহারা প্রস্থান করিলেন। আমার মত একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত লোকের হাতে দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নেতাকে ছাড়িয়া দেওয়ার ভরসা তাঁহারা কেমন করিয়া পাইলেন—ইহা ভাবিয়াই আমি বিস্মিত হইয়াছিলাম। তাঁহারা যেন মনে করিয়াছিলেন—নিজের লোকের কাছেই অরবিন্দ বাবুকে দিয়া যাইতেছেন। অতঃপর তাঁহারা চলিয়া গেলে, শ্রীঅরবিন্দ আমার মুখপানে চাহিয়া কি ভাবিয়া লইলেন তাহা জানি না। শ্রীঅরবিন্দের আগমনে আমার জীবনের দক্ষিণ-দুয়ার খুলিয়া ঝলকে ঝলকে বসন্তের বাতাস বহিতেছিল। আমি উন্মাদ হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম: "আপনি কিভাবে এখানে থাকিবেন?" শ্রীঅরবিন্দ জানাইলেন যে,

তিনি এখানে গোপন জীবন-যাপন করিবেন, কেহ যেন তাঁহার আগমন-সংবাদ জানিতে না পারে। আমি সতর্ক হইলাম। বৈঠকখানায় তাঁহাকে রাখা সম্ভবপর হইল না। এখানে এমন কত ভদ্রলোক আসেন, আলাপ করেন, দুই-চারিদিন থাকিয়া আবার চলিয়া যান—এই ঘরে তাঁর অবস্থান আমার নিরাপদ মনে হইল না। যে ঘরগুলিতে আমাদের চেয়ারের গুদাম ছিল, তাহাদের মধ্যে একখানি দ্বিতলের ঘরে আনিয়া তাঁহাকে বসাইলাম। তিনি চোরের মতই পা টিপিয়া টিপিয়া আমার অনুসরণ করিলেন, পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিয়া ইঙ্গিতেই জানাইলাম—"এইখানে কেহ সন্ধান পাইবে না,—আপনি এইখানেই থাকুন।"

ঘরের মেঝেয় একপুরু ধুলা জমিয়াছিল—কড়িকাঠে চামচিকা, আরশুলা, মাকড়সা প্রভৃতি জীবজন্তুগণ এতদিন স্বচ্ছন্দ জীবনযাপন করিতেছিল, আজ সে জগতে বিপ্লব সৃষ্টি করিতে ভরসা হইল না—তাহারা যদি বিদ্রোহ করে, বাড়ীর লোকেরা সব জানিতে পারিবে। মেঝেটীর উপর কিয়দংশ ঝাঁট দিয়া, একখানা শতরঞ্চি পাতিয়া দিলাম। তিনি নীরবেই তাহাতে উপবেশন করিলেন। আমি ইঙ্গিতেই বলিলাম: "একটু পরে আসিতেছি, খোঁজ পড়িলে বিপদ্ হইবে।" আমার জল-খাবারের রেকাবী সম্মুখে আসিলে, আমি ছল করিয়া আমার স্ত্রীকে বলিলাম: "আজ বৈঠকখানায় আমি আহার করিব।" বৈঠকখানায় গিয়া এদিক্ ওদিক্ উঁকি মারিয়া কাহারও দৃষ্টি আমার উপরে আছে কিনা দেখিয়া অতি সন্তর্পণে দালানের অলিন্দ অতিক্রম করিয়া, গুদামের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলাম। তারপর তাঁর সম্মুখে নিঃশব্দে থালাখানি ধরিয়া দিলাম। দেখিলাম, তিনি নীরবে ঊর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া বসিয়া আছেন। কি অপার্থিব প্রথম দর্শন!

শ্রীঅরবিন্দ ভাব-মুখেই আমার বাড়ী আসিয়াছিলেন—নিজেকে ভগবানের হাতে সম্পূর্ণরূপে ছাড়িয়া দিয়া তিনি নিশ্চিন্ত-চিত্ত হইয়াছিলেন। তিনি কথা কহিলে মনে হইত আর কেহ যেন তাঁর কণ্ঠ দিয়া কথা কহিতেছে। তাঁহার হস্তখানির সঞ্চালনেও যেন এই ভাবই প্রত্যক্ষ করিলাম। তাঁর সম্মুখে খাদ্যের রেকাবীখানি তুলিয়া ধরিয়া আমি বলিলাম: "বাড়ীতে কিছুই বলিবার উপায় নাই—কাজেই আমার জল-খাবার আনিয়াছি আপনি গ্রহণ করুন।" তাঁহাকে গোপন রাখার এই সকল ব্যবস্থা আমায় সেদিন উদ্ভ্রান্ত করিয়া তুলিল। তাঁহার স্নানের সময়ে দুই টব পাত-কুয়ার জল আনিয়া তাঁহার মাথায় ঢালিয়া দিলাম। তখনও শীতের শিহরণ আছে; কিন্তু দেখিলাম—তাঁহার শরীর শিহরিল না। তিনি যৎসামান্য খাদ্য গ্রহণ করিলেন। মধ্যাহ্নের আহার শেষ হইলে, আমি তাঁহাকে বৈঠকখানায় আনিলাম। তিনি পায়খানা যাওয়ার কথা আমায় বলিলেন। পায়খানায় যাইতে হইলে তখন একটা গলি-পথ দিয়া বাহিরে যাইতে হইত। তাঁহাকে নিরাপদে শৌচ কার্য্যাদি সমাপ্ত করাইলাম। সন্ধ্যার সময়ে কিন্তু বিপদে পড়িলাম: তাঁহাকে কোথায় ঘুমাইতে দিব, তাহা স্থির করিতে পারিলাম না। এক বন্ধুকে সব কথাই জানাইলাম। সন্ধ্যার পর উক্ত বন্ধুর বাড়ী লইয়া গিয়া তাঁহাকে রাখিয়া আসিলাম। আমায় পরদিন সন্ধ্যার সময়ে তিনি বলিলেন: "এখান হইতে আমায় লইয়া চলুন—কাল রাত্রে ঘুমাইতে পারি নাই।" আমার বন্ধু রাজী হইল। আমি তাঁহাকে আমার বাড়ীতে পুনরায় লইয়া আসিলাম। সমস্যা হইল কোথায় তাঁহাকে রাখিব—তিনি ধীরে ধীরে আমার সঙ্গে পতিত গৃহগুলি দেখিলেন এবং একখানি ঘর দেখিয়া বলিলেন: "এই ঘরেই আমি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিব।" আমি বুঝিলাম তিনি নির্জ্জনতাই ভালবাসেন। আমি ঘরখানি তাঁহার

জন্য পরিষ্কার করিয়া দিলাম। সেই ঘরখানিতে অনেক চেয়ার জমিয়াছিল, তাহা এক পাশে সরাইয়া, তাঁহাকে রাত্রিবাসের স্থান করিয়া দিলাম।

ঘরে কেহ ঢুকিতে না পারে তাহার ব্যবস্থা করিয়া আমি অতি প্রত্যূষে আমাদের কাঠের গোলায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। তারপর কাজ সারিয়া যথারীতি গৃহে প্রবেশ মাত্র আমার স্ত্রী উৎফুল্ল মুখে বলিলেন: "বলি তোমার কাণ্ডটা কি?" আমি অবাক হইয়া তাঁহার দিকে চাহিলাম। তিনি বলিয়া গেলেন: "আমাকেও লুকাইয়া কাজ করা ভগবান সহিবেন কেন?" আমি ভাবিলাম—সর্বনাশ হইল—শ্রীঅরবিন্দ যাহা বলিলেন তাহা তো পালন করা হইল না। চেয়ারের প্রাচীর ঘিরিয়া তাঁহাকে লুকাইয়া রাখিয়াছিলাম। আমার স্ত্রী বলিলেন: "ওঃ কি কপট! আমায় না বলিয়া কাহাকে লুকাইয়া রাখা হইয়াছে? আমার রোগ চারদিক দেখিয়া বেড়ান—কিন্তু কি সর্বনাশ এমন বেহিসেবী বেটা ছেলে তুমি—ভাগ্যি দুইখানা গামছা লইয়া গিয়াছিলাম—তাই রক্ষা! ওমা কি লজ্জার কথা! আমি কি করিয়া জানিব এই কয়েদের মধ্যে একজন আস্ত মানুষকে লুকাইয়া রাখিয়াছ! কে বল ত? খুনে না কাসুড়ে? এমন লোককে লুকাইয়া রাখিয়াছ? তোমার কাণ্ডখানা কি?"

আমি নম্রস্বরে বলিলাম: "তুমি নাম শুনিয়া থাকিবে, শ্রীঅরবিন্দকে লুকাইতে গিয়া তোমার নিকট ধরা পড়িয়াছি। আর কেহ জানিতে না পারে—সেইদিকে লক্ষ্য রাখিও।" তিনি হাসিয়া বলিলেন: "খুব লোকের হাতেই উনি আশ্রয় নিয়েছেন! এমন করিয়া রাখিলে, কয়দিন উনি টিকিবেন?"

তারপর হইতেই আহারাদির ব্যবস্থার ভার তার উপর রহিল।

এতদিন তাহার খাদ্যাদি হাটের দোকান হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল—আজ হইতে আমি রেহাই পাইলাম। মধ্যাহ্নে শ্রীঅরবিন্দ বলিলেন: "উনি তোমার স্ত্রী বুঝি?" আমি বলিলাম: "হ্যাঁ।" তাহাকে মাতৃমূর্ত্তি বলিয়া তিনি প্রশংসা করিয়াছিলেন। এই দিন হইতে শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে আমি নিশ্চিন্ত হইলাম। শ্রীঅরবিন্দকে আমি সানন্দে বলিলাম: "পরিচর্য্যার সুবিধা হইয়াছে, আর কেহ জানিবে না। আমার স্ত্রী যখন ভার লইয়াছেন, আমি রেহাই পাইলাম।"

এই কক্ষের সম্মুখে আজ যে স্মৃতি ফলকটি শোভা পাইতেছে সেইদিকে দৃষ্টি রাখিয়া আমি ভাবি—আমি শ্রীঅরবিন্দকে একদিনও লুকাইয়া রাখিতে পারি নাই—আমার স্ত্রীর নিকট ধরা পড়িয়াছি, কিন্তু তিনিই তার পরিচর্য্যার ভার তুলিয়া লইয়া আমায় নিশ্চিন্ত করেন। সে-দিনের সেই মধুময়ী স্মৃতি আমার বুকে এখনও সেই ভাবেই অঙ্কিত রহিয়াছে।

—"জ্ঞানী অজ্ঞানী, বদ্ধমুক্ত, সবই মনে। মনেই সাধু, মনেই অসাধু, মনেই পাপী, মনেই পুণ্যাত্মা। সুতরাং যার মন ঈশ্বরে সর্ব্বদা আছে তার আর সাধনার আবশ্যক কি?" —শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা

—"তোমাদের ধন ঐশ্বর্য্য আছে অথচ ঈশ্বরকে ডাকছো, এ খুব ভালো। গীতায় আছে, যারা যোগভ্রষ্ট তারাই ভক্ত হয়ে ধনীর ঘরে জন্মায়। পূর্ব্বজন্মে ঈশ্বরচিন্তা করতে করতে হঠাৎ ভোগ করবার লালসা হয়েছে। এরূপ স্থলে যোগভ্রষ্ট হয়। আবার পরজন্মে ঐরূপ জন্ম হয়। কামনা থাকতে, ভোগ লালসা থাকতে—মুক্তি নাই। তাই খাওয়া পরা সব করে নেবে। ভোগ লালসা থাকা ভাল নয়। আমি তাই জন্য যা যা মনে উঠতো অমনি করে নিতাম। বাগবাজারের রংকরা সন্দেশ খেতে ইচ্ছা হলো। এরা আনিয়ে দিলে। খুব খেলাম—তারপর অসুখ। একটি ছেলের দেখে সোনার গোট পরতে সাধ হলো। তা বেশীক্ষণ রাখবার জো নাই। গোট পরেই ভিতর দিয়ে শিড় শিড় করে উপরে বায়ু উঠতে লাগল—সোনা গায়ে ঠেকেছে কিনা? একটু রেখেই খুলে ফেলতে হলো। তা না হলে ছিঁড়ে ফেলতে হবে। ধনেখালির খইচুর, খানাকুল কৃষ্ণনগরের সরভোগ, তাও খেতে সাধ হয়েছিল। পেঁয়াজ খেলাম আর বিচার করলাম—মন, এর নাম পেঁয়াজ। তারপর মুখের ভেতর একবার এদিক ওদিক একবার সেদিক করে তারপর ফেলে দিলাম। সংসার ভোগের স্থান, এক একটি জিনিষ ভোগ করে অমনি ত্যাগ করতে হয়।"

—"সংসারে থাকতে গেলেই ওরকম হয়। কখনও উঁচু, কখনও নীচু। কখনও বেশ ভক্তি হচ্ছে, আবার কমে যায়। কামিনী কাঞ্চন নিয়ে থাকতে হয় কিনা, তাই হয়। সংসারে ভক্ত কখনও ঈশ্বর চিন্তা, হরিনাম করে, কখনও বা কামিনা কাঞ্চনে মন দিয়ে ফেলে। যেমন সাধারণ মাছি—কখনও সন্দেশে বসছে, কখনও বা পচা ঘা বা বিষ্ঠাতেও বসে। বিষয়ী লোকের জ্ঞান কখনও দেখা যায়। এক একবার দীপ-শিখার ন্যায়। ফুটো দিয়ে যেন কিরণটি আসছে। সংসারীদের ঈশ্বরানুরাগ ক্ষণিক। যেমন তপ্ত খোলায় জল পড়েছে—ছ্যাঁক করে উঠলো—তারপরেই শুকিয়ে গেল। সংসারী লোকদের ভোগের দিকে মন রয়েছে, তাই জন্যে সে অনুরাগ, সে ব্যাকুলতা হয় না। লোকে সাধন ভজন করে, কিন্তু মন কামিনী কাঞ্চনে, মন ভোগের দিকে, তাই সাধন ভজন ঠিক হয় না।"

*

—"বিষয়ীর ঈশ্বর কিরূপ জান? যেমন খুড়া জেঠির কোঁদল শুনে ছেলেরা খেলা করবার সময় পরস্পর বলে, 'আমার ঈশ্বরের দিব্য', আর যেমন কোন ফিট বাবু, পান চিবুতে চিবুতে ষ্টিক হাতে করে বাগানে বেড়াতে বেড়াতে একটি ফুল তুলে বন্ধুকে বলে,—ঈশ্বর কি বিউটিফুল ফুল করেছেন।"

*

—"বিষয়ী লোকের রোক নাই। হোলো হেলো, না হেলো না হোলো। জলের দরকার হয়েছে কূপ খুঁড়ছে। খুঁড়তে খুঁড়তে যেমন পাথর বেরুল, অমনি সেখানটা ছেড়ে দিলে। আর এক জায়গায় খুঁড়তে বালি পেয়ে গেল, কেবল বালি বেরোয়। সেখানটাও ছেড়ে দিলে। যেখানটা খুঁড়তে

আরম্ভ করেছে সেখানেই খুঁড়বে, তবে তো জল পাবে। যে যেমন কর্ম করে তেমনি ফল পায়। বিষয়ী লোকের ঈশ্বরের নাম করা—অনুরাগ নাই।"

—"যারা নিজে সতরঞ্চ খেলে, তারা চাল তত বুঝে না, কিন্তু যারা না খেলে, উপর চাল বলে দেয়, তাদের চাল ওদের চেয়ে অনেকটা ঠিক ঠিক হয়। সংসারী লোক মনে করে, আমরা বড় বুদ্ধিমান। কিন্তু তারা বিষয়াসক্ত। নিজে খেলছে। নিজের চাল ঠিক বুঝতে পারে না, কিন্তু সংসার ত্যাগী সাধুলোক বিষয়ে অনাসক্ত। তারা সংসারীদের চেয়ে বুদ্ধিমান। নিজে খেলে না, তাই উপর চাল ঠিক বলে দিতে পারে।"

*

—"অভিমান ত্যাগ করা বড় কঠিন। এই বিচার কচ্ছ, অভিমান কিছু নয়। আবার কোথা থেকে এসে পড়ে। ছাগলকে কেটে ফেলা গেছে, তবু অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নড়ছে। স্বপ্নে ভয় দেখেছো, ঘুম ভেঙ্গে গেল, বেশ জেগে উঠলে তবু বুক দুড় দুড় করে। অভিমান ঠিক সেই রকম। তাড়িয়ে দিলেও আবার কোথা থেকে এসে পড়ে। অমনি মুখ ভার করে বলে, আমায় খাতির করলে না।"

—"তোমাদের সব ত্যাগ করতে হবে কেন? তোমরা রশে বশে বেশ আছ। সারে মাতে! তোমরা বেশ আছ। নক্সা খেলা জান? এক রকম তাস খেলা। সতের ফোঁটার বেশী হলে জলে যায়। আমি

বেশী কাটিয়ে জ্বলে গেছি। তোমরা খুব সেয়ানা। কেউ দশে আছ, কেউ ছয়ে আছ, কেউ পাঁচে আছ! বেশী কাটাও নাই, তাই আমার মত জ্বলে যাও নাই। খেলা চলছে। এ ত বেশ। সত্য বলছি তোমরা সংসার করছো এতে দোষ নাই। তবে ঈশ্বরের দিকে মন রাখতে হবে। তা না হলে হবে না। এক হাতে কর্ম্ম কর, আর এক হাতে ঈশ্বরকে ধরে থাকো। কর্ম্ম শেষ হলে দুই হাতে ঈশ্বরকে ধরবে।"

—"সংসার থেকে যে তাঁকে ডাকে সে বীর ভক্ত। ভগবান বল্লেন, যে সংসার ছেড়ে দিয়েছে সে ত আমায় ডাকবেই, আমার সেবা করবেই তার আর বাহাদুরী কি? সে যদি আমায় না ডাকে সকলে ছি ছি করবে। আর যে সংসার থেকে আমায় ডাকে—বিশ মন পাথর ঠেলে যে আমায় দেখে সেইই ধন্য। সেইই বাহাদুর, সেইই বীরপুরুষ। তোমরা সংসারী, তোমরা এও রাখ অও রাখ। সংসারও রাখ ধর্ম্মও রাখ।"

—"হয়তো বনেদি ঘর। পতিপুত্তুর সব মরে গেল—কেউ নেই—রইল কেবল গোটাকতক রাঁড়ী। তাদের মরণ নেই। বাড়ীর এখানটা পড়ে গেছে, ওখানটা ধ্বসে গেছে, ছাদের ওপর অশ্বত্থ গাছ জন্মেছে, তার সঙ্গে দুচার গাছা ডেঙ্গো ডাটাও জন্মেছে; রাঁড়ীটা তাই তুলে চচ্চড়ি রাঁধছে ও সংসার করছে। কেন? ভগবানকে ডাকুক না কেন? তাঁর শরণাপন্ন হোক না—তার ত সময় হয়েছে। তা হবে না।"

—"হয়তো বা কারুর বিয়ের পরে স্বামী মরে গেল—কড়ে রাড়ি। ভগবানকে ডাকুক না কেন? তা নয়—ভাইয়ের ঘরে গিন্নি হলো। মাথায় কাগা খোঁপা, আঁচলে চাবির থোলো বেঁধে, হাত নেড়ে গিন্নিপনা করছে—সর্ব্বনাশীকে দেখলে পাড়াশুদ্ধ লোক ডরায়। তবু তারা বলে বেড়াচ্ছেন—'আমি না হলে দাদার খাওয়াই হয় না।' মর মাগি, তোর কি হল তা ত্যাখ—তা না।"

*

—"সব্বাই সংসার ত্যাগ করবে কেন? আর তাঁর কি ইচ্ছা যে, সকলেই শিয়াল কুকুরের মত কামিনী কাঞ্চনে মুখ জুবড়ে থাকে? আর কি কিছু ইচ্ছা তাঁর নয়? কোনটা তাঁর ইচ্ছা, কোনটা অনিচ্ছা কি সব জেনেছ? তাঁর ইচ্ছা সংসার করা তুমি বলছ। যখন স্ত্রী পুত্র মরে তখন ভগবানের ইচ্ছা দেখতে পাও না কেন? তাঁর কি ইচ্ছা মায়াতে জানতে দেয় না। তাঁর মায়াতে অনিত্যকে নিত্য বোধ হয়, আবার নিত্যকে অনিত্য বোধ হয়। সংসার অনিত্য—এই আছে, এই নাই, কিন্তু তাঁর মায়াতে বোধ হয় এই ঠিক। তাঁর মায়াতেই আমি কর্ত্তা বোধ হয়, আর আমার এই সব, স্ত্রী পুত্র, ভাই ভগিনী, বাপ মা, বাড়ী ঘর—এই সব আমার বোধ হয়।"

শ্রীশ্রীবুদ্ধদেবের কথা

—"প্রবাসী বণিকদের মুখে সিদ্ধার্থের কঠোর তপশ্চর্য্যার কথা শুনে রাজা শুদ্ধোদন চিন্তিত হলেন, এবং স্বীয় মন্ত্রীপুত্র উদঙ্গীকে নিরুদ্দিষ্ট পুত্রের সংবাদ আনাতে পাঠালেন। উদঙ্গী ছিলেন সিদ্ধার্থের সমবয়সী ও সহপাঠী। তিনি উরুবিল্বে গিয়ে বোধিসত্ত্বকে বললেন, 'আমি তোমার বাল্য-

সখা উদঙ্গী। পিতা শুদ্ধোদন তোমায় অদর্শনে মৃতপ্রায়। তুমি তাঁকে একবার দেখতে যাবে না?' সুগভীর বোধিধ্যানে সিদ্ধার্থের পূর্ব্বস্মৃতি লোপ পেয়েছিল। নিজ নামটি পর্য্যন্ত তাঁর স্মরণ হল না। তিনি চমৎকৃত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে সিদ্ধার্থ? কে শুদ্ধোদন? কেই বা উদঙ্গী? ঋষি পতঞ্জলি তাঁর যোগসূত্রে বলেছেন যে, সমাধিলাভের পূর্ব্বে সাধকের অতীত জীবনের সর্ব্বস্মৃতির বিলোপ ঘটে। শোনা যায়, চৈতন্যদেব কাটোয়াতে কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস নেবার পর তিনদিন ভগবদ্‌ভাবে বিভোর ছিলেন এবং স্থানীয় রাখালকে ব্রজবালক, গঙ্গাকে যমুনা ও নিত্যানন্দকে বলরাম ভেবেছিলেন'।"

—"দুর্ব্বল দেহে সিদ্ধার্থ একদিন একাকী নৈরঞ্জনা নদীতীরে বেড়াতে ছিলেন। পার্শ্ববর্ত্তী পল্লীর স্বাধ্বী রমণী সুজাতা বনদেবতার সন্ধানে সেখানে এলো এবং কৃচ্ছসাধনে ম্রিয়মান, অথচ জ্যোতির্ম্ময় সন্ন্যাসীকে দেখে বনদেবতা মনে করল। সে সঙ্কল্প করেছিল তার একটি পুত্র হলে বনদেবতাকে পূজা দেবে। সে পায়সান্ন নিয়ে সিদ্ধার্থের সম্মুখে উপস্থিত হল। সিদ্ধার্থ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি এনেছ মা?' সুজাতা করযোড়ে বললে, 'ভগবন্, আমি আপনার জন্য এই পয়সান্ন এনেছি। আমি শত গাভীদুগ্ধে পঞ্চাশটি গাভী পোষণ করেছিলাম। সেই পঞ্চাশটি গাভীর দুগ্ধে পঁচিশটি গাভী পুনরায় পোষণ করেছি। আবার সেই পঁচিশটি গাভীর দুগ্ধে বারটি গাভী পুষ্ট করেছি। সেই বারটি গাভীর দুগ্ধ খাইয়ে আরও ছয়টি ভাল ভাল গাভী পালন করেছি। তারপর তাদের দুগ্ধ দোহন করে উৎকৃষ্ট তণ্ডুলে সুগন্ধি মশলা দিয়ে এই পায়সান্ন পাক করেছি। আমার সংকল্প ছিল যে, একটি পুত্র হলে এই পায়সান্ন

বনদেবতাকে উৎসর্গ করব। এখন এই পায়সান্ন আপনি গ্রহণ ও আহার করুন।' সিদ্ধার্থ সুজাতাকে শুভাশীষ দিয়ে বললেন, 'তুমি যেমন তোমার ব্রত পালন করে সুখী হয়েছ, আমিও তেমনি আমার জীবন ব্রত সাধন করে বুদ্ধ হতে পারি।' সুজাতার পায়স খেয়ে সিদ্ধার্থ শরীরে একটু বল পেলেন এবং পুনরায় বোধিলাভের জন্য অটল সঙ্কল্প করলেন।"

—"বোধিলাভের পর বুদ্ধদেব নির্ব্বাণলব্ধ মহানন্দে সাত সপ্তাহ নির্ব্বাক রইলেন। তিনি নীরবে বোধিদ্রুম তলে পাদচারণা করতে করতে ভাবতে লাগলেন, 'আমি যে মহাসত্য উপলব্ধি করেছি তা বিষয়ীরাম বুঝতে পারবে না। তারা ইন্দ্রিয় সুখে এত উন্মত্ত যে, নির্ব্বাণের পর সুখের জন্য চেষ্টা করবে না। আত্মজয়ে যে মহামুক্তি, যে মহানন্দ লাভ হয় তা ইন্দ্রিয়দাসের বোধগম্য নয়। হিংসা দ্বেষাদি দ্বন্দ্বে যারা জড়িত তারা নির্ব্বাণসুখ থেকে বঞ্চিত হয়, তারা অমৃতত্ত্বের অধিকারী হয় না। আমি যদি ধর্ম্মপ্রচার করি সংসারীরা তা অনুসরণ করবে না, আমার কষ্ট ও শ্রমই সার হবে।' তখন দেবতা ব্রহ্মা স্বর্গ থেকে নেমে তাঁর সম্মুখে আবির্ভূত হলেন এবং জগতে ধর্ম্মপ্রচারের জন্য তাঁকে আন্তরিক আর্তি জানালেন। তিনি বুদ্ধদেবকে সম্বোধন করে বললেন, 'আপনি কর্ণধার হয়ে প্রকৃত মানুষকে ধর্ম্মপথ না দেখালে তারা ভবার্ণবে ডুবে মরবে।' ব্রহ্মার অনুরোধে বুদ্ধদেব ধর্ম্মপ্রচারে সম্মত হলেন। তাঁর মনে মৈত্রী ও করুণা সমুদিত হল। তিনি জগদ্ধিতায় অবশিষ্ট জীবন উৎসর্গ করতে সঙ্কল্প করলেন এবং বললেন, 'অমৃতত্ত্বের দ্বার সকলের জন্য উন্মুক্ত হোক। যাদের জ্ঞান আছে তারা বুদ্ধবাণী শুনুক। জগতের

প্রত্যেক মানুষটি পর্য্যন্ত মুক্ত না হলে, ধর্ম্মলাভ না করলে আমি মহাপ্রয়াণ করব না।' বুদ্ধের করুণ দৃষ্টি দেখে ও মৌন সম্মতি জেনে ব্রহ্মা সানন্দে অন্তর্হিত হলেন।"

—"কাশী যাওয়ার পথে তরুণ ব্রাহ্মণ জৈন উপাসকের সঙ্গে বুদ্ধদেবের দেখা হল। উপক তাঁর পূর্ব্বপরিচিত ছিলেন। তিনি বুদ্ধদেবের জ্যোতির্ময় মুখমণ্ডল দেখে বললেন, 'আপনার প্রশান্ত মূর্ত্তি ও উজ্জ্বল চক্ষু দেখে মনে হয়, আপনি অমৃততত্ত্ব লাভ করেছেন।' বুদ্ধদেব বললেন, 'আমার 'আমি' মুছে গেছে। আমার দেহ শুদ্ধ ও মন বাসনামুক্ত। সত্যালোকে আমার অন্তর উদ্ভাসিত। আমি নির্ব্বাণ লাভ করেছি। এজন্য আমার মুখমণ্ডল এত সৌম্য ও শান্ত এবং আমার নয়নযুগল এত সমুজ্জ্বল। আমি মর্ত্ত্যলোকে ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে চাই। যারা অজ্ঞানের আঁধারে আবৃত তাদের আমি অমৃততত্ত্বের পথ দেখাতে ইচ্ছা করি।' উপক উত্তর দিলেন, 'তবে আপনি মহাজন, বিশ্বজয়ী, জিতেন্দ্রিয়।' বুদ্ধদেব বললেন, 'উপক, আমি সত্যই জিন।' উপক মাথা নেড়ে বললেন, 'হে গৌতম! আপনার পথ ঐ দিকে।' এই বলে উপক অন্যপথে চলে গেলেন।"

শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য্যের কথা

"পণ্ডিতে পণ্ডিতে আলাপ অপূর্ব্ব দৃশ্য। কেরলাধীশ রাজশেখর নানা শাস্ত্রকথায় প্রবৃত্ত হলেন। সর্ব্ববিষয়েই শঙ্করাচার্য্যের অগাধ পাণ্ডিত্য সূক্ষ্মদৃষ্টি ও বিচারপটুতা দেখে তিনি অতিশয় বিস্মিত হলেন। শঙ্করাচার্য্যের উপর শ্রদ্ধা তাঁর অত্যন্ত বেড়ে গেল। তাঁর অমানুষিক শক্তিতে তাঁর

আর সংশয় থাকল না। এইরূপে বহুক্ষণ শাস্ত্রালাপের পর রাজা বিদায় ভিক্ষা করলেন এবং তাঁর ইঙ্গিতমাত্রে মন্ত্রীবর শঙ্করাচার্য্যের চরণপ্রান্তে সহস্র সুবর্ণমুদ্রা রাখলেন। রাজা তখন শঙ্করাচার্য্যের চরণে প্রণাম করে তাঁকে সেই মুদ্রা গ্রহণে অনুরোধ করলেন। শঙ্করাচার্য্য হাস্য করে গম্ভীর ভাবে রাজাকে বললেন, 'মহারাজ! আমি ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণ, আমার অর্থে কি প্রয়োজন? আপনার পূর্ব্বপুরুষগণ আমার পিতৃপিতামহগণকে যা দান করে গিয়েছেন তাতেই আমার জননীর সংসার বেশ স্বচ্ছল, আমাদের কোন অভাব নাই।' তখন রাজা যেন একটু অপ্রতিভ হয়ে বললেন, 'মহাত্মন! একথা আপনার মুখেই শোভা পায় বটে! তবে, আপনি উহা উপযুক্ত পাত্রে বিতরণ করে দিন। আপনার উদ্দেশ্যে আনীত দ্রব্য রাজার পুনর্গ্রহণ করা অন্যায়।' অসামান্য প্রতিভাসম্পন্ন বালক শঙ্করাচার্য্য কাল বিলম্ব না করে বললেন, 'মহারাজ! আপনি দেশের রাজা, পাত্রাপাত্র জ্ঞান শাস্ত্রসেবী ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণ কুমার অপেক্ষা আপনারই বেশী থাকবার কথা। আপনি উহা সৎপাত্রে বিতরণ করিয়ে দিন। বিদ্যাদান আমার কর্ম্ম, ধনদান আপনাদের কর্ম্ম। অতএব এ কার্য্য আপনার পক্ষেই শোভন।"

—"বহু তপস্যার অমূল্য রত্ন অকালে হারাতে হবে—এই শুনে শঙ্করাচার্য্যের জননী শোকে অভিভূতা হয়ে পড়লেন। বালক শঙ্করাচার্য্যের মনে কিন্তু অন্যরূপ চিন্তা প্রবেশ করল। শঙ্করাচার্য্য ভাবতে লাগলেন—এই অল্প দিনের মধ্যে মাত্র বত্রিশ বৎসর মধ্যে সাধনার সিদ্ধি লাভ কি করে করতে পারব? কবেই বা সিদ্ধিলাভ করব, আর কবেই বা দেশের এই দুরবস্থা দূর করব। এই কদিন মাত্র অধ্যাপনায় প্রবৃত্ত হয়ে লোকসঙ্গ

করছি ! এতেই ত দেখছি—দেশে দশের অবস্থা কিরূপ ? এদিকে পথ প্রদর্শন করা একান্ত আবশ্যক। ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মের অনুষ্ঠান। আত্মহিত কাকে বলে তা তো দেখছি সকলেই বিস্মৃত। আর সন্ন্যাসী ব্যতীত সে সিদ্ধিলাভই বা কি করে হবে। সন্ন্যাস ব্যতীত জ্ঞান হয় না এবং জ্ঞান ব্যতীত মুক্তিও হয় না। সেই জ্ঞান আবার সদগুরু সাপেক্ষ। কোথায় আর কবেই বা সেই সদগুরু লাভ হবে। এইরূপ নানা প্রকার চিন্তা শঙ্করের চিত্ত আলোড়িত করতে লাগল। মাতা ও পুত্র উভয়েই এখন নিজ নিজ চিন্তায় উন্মনা। উভয়েই নিজ নিজ ভবিষ্যৎ ভাবনায় ব্যাকুল। কিন্তু জননীর বিমর্ষ ও ব্যাকুলভাবে শঙ্করাচার্য্যকে আর এ চিন্তা করতে দিল না। শঙ্করাচার্য্য নিজ ভাব সংযত করে জননীর শোকাপনোদনার্থ নানারূপ জ্ঞানের কথা বলতে লাগলেন। জননীও, পাছে শঙ্করাচার্য্য ব্যাকুল হন ভেবে নিজ ভাব গোপন করলেন।”

যিশু খৃষ্টের কথা

—“কঠোর সাধনায় সিদ্ধিলাভ কোরে ভগবান ঈশা তাঁর বাণী প্রচারে প্রবৃত্ত হোলেন। অগণিত নরনারী তাঁর কথামৃত পান কোরে তৃপ্ত হোলো, তাঁর অলৌকিক শক্তি দর্শনে বিস্মিত হোলো। পাহাড়ের ওপর জনতার সামনে তিনি তাঁর নবধর্ম্মের বার্তা প্রচার কোরলেন। ইহুদীরা জানতো —বন্ধুকে ভালোবাসবে, শত্রুকে ঘৃণা কোর্ব্বে, এই হচ্ছে ভগবানের নির্দ্দেশ। ঈশদূত ঈশা জলদ গম্ভীর স্বরে প্রচার কোরলেন—শত্রুকেও ভালো বাসবে, তোমার প্রতিবেশীকে আত্মবৎ দর্শন কোর্ব্বে, তা সে যে ধর্ম্ম বা যে সম্প্রদায়ের লোকই হোক না কেন। এই উদার মানবতার বাণী শুনে ধর্ম্মান্ধ ইহুদীরা অবাক হোয়ে গেল। শুধু তাই নয়, তিনি

আচারবহুল ইহুদী ধর্ম্মকে অন্তর্মুখী কোরে তুল্লেন। প্রাচীন ইহুদীরা জানতো, নরহত্যা কোর্ব্বে না, এইটেই হচ্ছে তাদের ধর্ম্মের নির্দ্দেশ। কিন্তু ঈশা বল্লেন—মনে মনেও কারো প্রতি ঈর্ষ্যা বা বৈরভাব পোষণ কোরবে না। ভগবান হচ্ছেন অন্তর্যামী, তিনি তোমাদের অন্তর দেখতে পান, অন্তরের প্রবৃত্তি অনুসারেই তিনি দণ্ড বা পুরস্কারের বিধান কর্ব্বেন। প্রাচীন ইহুদীরা জানতো—ব্যভিচার কোর্ব্বে না, এইটেই তাদের ধর্ম্মের নির্দ্দেশ। ঈশা বল্লেন—যে অপবিত্র ভাব নিয়ে কোনো নারীর দিকে তাকাবে, সেও ব্যভিচারের অপরাধে অপরাধী হবে। এমনি কোরে ঈশা ইহুদীদের ভেতর স্থাপন কোরলেন অহিংসার আদর্শ, মৈত্রীর আদর্শ, সংযমের আদর্শ।

ঈশা যে নবধর্ম্মের বার্ত্তা নিয়ে পৃথিবীতে এসেছিলেন, ইহুদীরা যখন তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হোলেন, তখন তিনি তাঁর দ্বাদশ শিষ্যকে ধর্ম্ম প্রচারের জন্যে পাঠিয়ে দিলেন। এই দ্বাদশ শিষ্যের একজন খ্রীষ্টের প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা কোরেছিল, তাঁকে শত্রুর হাতে ধরিয়ে দিয়েছিল। এর নাম ছিল Judas Isacriot.

"ঈশা তাঁর দ্বাদশ শিষ্যকে যে উপদেশ দিয়েছিলেন, তার কয়েকটি এই—

'তোমরা যেখানে যাবে, সেখানে এই আশার বাণী প্রচার কোর্ব্বে যে, পৃথিবীতে অচিরেই স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে।

তোমাদের সঙ্গে সোনা, রূপা, পিতল ইত্যাদি ধাতুদ্রব্য বহন কোর্ব্বে না। পাদুকা বা দণ্ড ধারণ কোর্ব্বে না। একটিমাত্র জামা হবে

তোমাদের গাত্রাবরণ। কোনো নগরে গেলে প্রথমেই সন্ধান নেবে, কে তোমাদের উপদেশ গ্রহণের যোগ্য অধিকারী, তারি গৃহে অবস্থিতি কোর্ব্বে। সেই গৃহটিকে নমস্কার কোর্ব্বে, শান্তির স্নিগ্ধ ধারায় সেই গৃহটিকে অভিষিক্ত কোর্ব্বে!

তোমাদের অনেক নির্য্যাতন সইতে হবে, আমার নাম গ্রহণ করার জন্যে লোকে তোমাদের সবার চাইতে বেশী ঘৃণা কোর্ব্বে, কিন্তু যে শেষ পর্য্যন্ত সইতে পার্ব্বে, সেই পরিত্রাণ পাবে। (তুলনীয়ঃ যে সয়, সে রয়, যে না সয়, সে নাশ হয়।)

তোমাদের আমি যা গোপনে বলি, তোমরা তা প্রকাশ্যে প্রচার কোরো, তোমরা যা কানে শোনো, তা গৃহ-শীর্ষে প্রচার কোরো।

যারা শুধু দেহকে বিনাশ করে তাদের ভয় কোরো না কিন্তু যারা দেহের সঙ্গে আত্মারও বিনষ্টি সাধন করে, তারা সত্যই ভয়ের পাত্র।

মনে কোরো না, আমি পৃথিবীতে এসেছি শান্তি স্থাপন কোরতে, আমি পৃথিবীতে শান্তির বাহক নই, আমি এনেছি তরবারি।

যারা মাতাপিতা বা সন্তান-সন্ততিকে আমার চাইতে প্রিয়তর বলে মনে করে, তারা আমাকে লাভের যোগ্য নয়। যে ক্রুশ ধারণ কোরে আমার অনুসরণ না করে, সে আমাকে লাভ করার যোগ্য হয় নি। (ক্রুশধারণ হচ্ছে ত্যাগ ও দুঃখবরণের প্রতীক। ক্রুশধারণের আর একটি অর্থ হচ্ছে অহংবুদ্ধিকে বিসর্জ্জন দেওয়া।)

যারা ভোগের পথে যাবে, তারা আমায় পাবে না, যারা আমার জন্যে সর্ব্বস্ব ত্যাগ কোর্ব্বে, অনন্ত জীবনের অধিকারী হবে তারাই।"

শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের কথা

—"শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কিছুদিন শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে থেকে পানিহাটী গ্রামে রাঘব পণ্ডিতের গৃহে এলেন। রাঘব পণ্ডিত কৃষ্ণ সেবা করছেন এমন সময়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এসে উপস্থিত হলেন। রাঘব পণ্ডিত দণ্ডবৎ ভূমিতে পতিত হয়ে প্রণাম করলেন এবং ভক্তির আবেগে কাঁদতে লাগলেন, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁকে প্রেমভরে আলিঙ্গন দান করলেন। রাঘব পণ্ডিতের আনন্দের সীমা নাই। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন—'আমি রাঘবের ঘরে এসে সব দুঃখ ভুললাম। গঙ্গায় স্নান করলে যে আনন্দ হয় রাঘবের ঘরে এসে আমি সেই আনন্দ পেলাম।' এই বলে মৃদু হেসে বললেন, 'রাঘব পণ্ডিত তুমি শীঘ্র গিয়ে রন্ধন করে কৃষ্ণকে ভোজন করাও।' রাঘব পণ্ডিত এই আজ্ঞা পেয়ে প্রেমভরে রন্ধন করতে চললেন এবং নানা অপূর্ব্ব ভক্ষদ্রব্য প্রস্তুত করলেন। শ্রীনিত্যানন্দ ও নিজগণ সঙ্গে নিয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভোজন করতে এলেন, ভোজন করতে করতে বলিলেন— 'প্রভু বলে রাঘবের কি সুন্দর পাক।
এমত কোথাও আমি নাহি খাই শাক॥'

কাঙ্গালের ঠাকুর শ্রীচৈতন্যের শাকে বড়ই প্রীতি জেনে রাঘব পণ্ডিত বিবিধ প্রকার শাক রন্ধন করেছেন।

এইমত নানা রঙ্গে ভোজন করে প্রভু আচমন করলেন। রাঘবের গৃহে শ্রীগৌরসুন্দর এসেছেন এই সংবাদ পেয়ে শ্রীগদাধর দাস সত্বর এলেন। গদাধর দাস প্রভুর পরম প্রিয়, পরম ভক্তিমান। শ্রীগদাধর দাস শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর চরণে প্রণাম করলেন। প্রভুও তাঁর মস্তকে শ্রীপাদপদ্ম তুলে দিলেন। ক্রমে ক্রমে পুরন্দর পণ্ডিত,

তোমাদের গাত্রাবরণ। কোনো নগরে গেলে প্রথমেই সন্ধান নেবে, কে তোমাদের উপদেশ গ্রহণের যোগ্য অধিকারী, তারি গৃহে অবস্থিতি কোর্ব্বে। সেই গৃহটিকে নমস্কার কোর্ব্বে, শান্তির স্নিগ্ধ ধারায় সেই গৃহটিকে অভিষিক্ত কোর্ব্বে!

তোমাদের অনেক নির্য্যাতন সইতে হবে, আমার নাম গ্রহণ করার জন্যে লোকে তোমাদের সবার চাইতে বেশী ঘৃণা কোর্ব্বে, কিন্তু যে শেষ পর্য্যন্ত সইতে পার্ব্বে, সেই পরিত্রাণ পাবে। (তুলনীয়ঃ যে সয়, সে রয়, যে না সয়, সে নাশ হয়।)

তোমাদের আমি যা গোপনে বলি, তোমরা তা প্রকাশ্যে প্রচার কোরো, তোমরা যা কানে শোনো, তা গৃহ-শীর্ষে প্রচার কোরো।

যারা শুধু দেহকে বিনাশ করে তাদের ভয় কোরো না কিন্তু যারা দেহের সঙ্গে আত্মারও বিনষ্টি সাধন করে, তারা সত্যই ভয়ের পাত্র।

মনে কোরো না, আমি পৃথিবীতে এসেছি শান্তি স্থাপন কোরতে, আমি পৃথিবীতে শান্তির বাহক নই, আমি এনেছি তরবারি।

যারা মাতাপিতা বা সন্তান-সন্ততিকে আমার চাইতে প্রিয়তর বলে মনে করে, তারা আমাকে লাভের যোগ্য নয়। যে ক্রশ ধারণ কোরে আমার অনুসরণ না করে, সে আমাকে লাভ করার যোগ্য হয় নি। (ক্রশধারণ হচ্ছে ত্যাগ ও দুঃখবরণের প্রতীক। ক্রশধারণের আর একটি অর্থ হচ্ছে অহংবুদ্ধিকে বিসর্জ্জন দেওয়া।)

যারা ভোগের পথে যাবে, তারা আমায় পাবে না, যারা আমার জন্যে সর্ব্বস্ব ত্যাগ কোর্ব্বে, অনন্ত জীবনের অধিকারী হবে তারাই।"

শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের কথা

—"শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কিছুদিন শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে থেকে পানিহাটী গ্রামে রাঘব পণ্ডিতের গৃহে এলেন। রাঘব পণ্ডিত কৃষ্ণ সেবা করছেন এমন সময়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এসে উপস্থিত হলেন। রাঘব পণ্ডিত দণ্ডবৎ ভূমিতে পতিত হয়ে প্রণাম করলেন এবং ভক্তির আবেগে কাঁদতে লাগলেন, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁকে প্রেমভরে আলিঙ্গন দান করলেন। রাঘব পণ্ডিতের আনন্দের সীমা নাই। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন—'আমি রাঘবের ঘরে এসে সব দুঃখ ভুললাম। গঙ্গায় স্নান করলে যে আনন্দ হয় রাঘবের ঘরে এসে আমি সেই আনন্দ পেলাম।' এই বলে মৃদু হেসে বললেন, 'রাঘব পণ্ডিত তুমি শীঘ্র গিয়ে রন্ধন করে কৃষ্ণকে ভোজন করাও।' রাঘব পণ্ডিত এই আজ্ঞা পেয়ে প্রেমভরে রন্ধন করতে চললেন এবং নানা অপূর্ব্ব ভক্ষদ্রব্য প্রস্তুত করলেন। শ্রীনিত্যানন্দ ও নিজগণ সঙ্গে নিয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভোজন করতে এলেন, ভোজন করতে করতে বলিলেন— 'প্রভু বলে রাঘবের কি সুন্দর পাক।

এমত কোথাও আমি নাহি খাই শাক॥'

কাঙ্গালের ঠাকুর শ্রীচৈতন্যের শাকে বড়ই প্রীতি জেনে রাঘব পণ্ডিত বিবিধ প্রকার শাক রন্ধন করেছেন।

এইমত নানা রঙ্গে ভোজন করে প্রভু আচমন করলেন। রাঘবের গৃহে শ্রীগৌরসুন্দর এসেছেন এই সংবাদ পেয়ে শ্রীগদাধর দাস সত্বর এলেন। গদাধর দাস প্রভুর পরম প্রিয়, পরম ভক্তিমান। শ্রীগদাধর দাস শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর চরণে প্রণাম করলেন। প্রভুও তাঁর মস্তকে শ্রীপাদপদ্ম তুলে দিলেন। ক্রমে ক্রমে পুরন্দর পণ্ডিত,

পরমেশ্বর দাস প্রভৃতি পরম বৈষ্ণবগণ এসে প্রভুর সঙ্গে মিলিত হলেন,—পাণিহাটী গ্রামে পরম আনন্দ হল। একদিন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নিভৃতে বসে আপনার অভিন্ন স্বরূপ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর স্বরূপ তত্ত্ব বলতে লাগলেন—

'রাঘব! তোমারে আমি নিজ গোপ্য কহি।
আমার দ্বিতীয় নাহি নিত্যানন্দ বহি॥
এই নিত্যানন্দ যেই করায় আমারে।
সেই করি আমি—এই বলিল তোমারে॥
আমার সকল কর্ম্ম নিত্যানন্দ দ্বারে।
এই আমি অকপটে কহিল তোমারে॥
যেই আমি, সেই নিত্যানন্দ—ভেদ নাই।
তোমার ঘরেই সব জানিবা সেথাই।
মহাযোগেশ্বরো যাহা পাইতে দুর্ল্লভ।
নিত্যানন্দ হইতে তাহা পাইবা সুলভ॥
এতেকে হইয়া তুমি মহা সাবধান।
নিত্যানন্দ সেবিহ—যে হেন ভগবান॥'

মকরধ্বজ কর নামক ভক্তের প্রতি শ্রীগৌরসুন্দর আজ্ঞা করলেন, তুমি সর্ব্বদা রাঘব পণ্ডিতের সেবা করো, রাঘব পণ্ডিতের প্রতি তোমার যে প্রীতি তা আমার প্রতিই প্রীতি এ সুনিশ্চয় জেনো। এই প্রকারে পানিহাটী ধন্য করে শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর কিছুদিন অবস্থান করলেন।"

*

"শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পাণিহাটী হতে বরাহনগরে এক মহাভাগ্যবন্ত ব্রাহ্মণের ঘরে আগমন করলেন। সেই ভাগ্যবন্ত ব্রাহ্মণের নাম শ্রীরঘুনাথ

ভট্টাচার্য্য, তিনি শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর শিষ্য, ভাগবত শাস্ত্রে তাঁর অপার পাণ্ডিত্য। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে আচম্বিতে নিজগৃহে আগমন করতে দেখে তিনি মহানন্দে ভাগবত পড়তে লাগলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর ভক্তিযোগের পঠন শুনে আবিষ্ট হলেন—

'বোল বোল' বলে প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ রায়।
হুঙ্কার গর্জ্জন প্রভু করয়ে সদায়॥
সেই বিপ্র পড়ে পরানন্দে মগ্ন হৈয়া।
প্রভুও করেন নৃত্য বাহ্য পাসরিয়া॥
ভক্তির মহিমা শ্লোক শুনিতে শুনিতে।
পুনঃপুনঃ আছাড় পড়েন পৃথিবীতে॥
হেন সে করেন প্রভু প্রেমের প্রকাশ।
আছাড় দেখিতে সর্ব্বলোক পায় ত্রাস॥
এইমত রাত্রি তিন প্রহর অবধি।
ভাগবত শুনিয়া নাচিলা গুণনিধি॥'

শ্রীরঘুনাথ ভট্টাচার্য্যের মুখে ভাগবত পাঠ শুনে রাত্রি তিন প্রহর অবধি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রেমাবিষ্ট হয়ে নৃত্য করলেন, তারপর বাহ্য পেয়ে—

'প্রভু বলে ভাগবত এ মত পড়িতে।
কভু নাহি শুনি আর কাহার মুখেতে॥
এতেকে তোমার নাম 'ভাগবতাচার্য্য'।
ইহা বিনা আর কোন না করিহ কার্য্য॥'

শ্রীরঘুনাথ ভট্টাচার্য্যের প্রতি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দত্ত যথাযোগ্য উপাধি শুনে সকলে হরিধ্বনি করতে লাগলেন।

সেদিন ছিল গৌণ কৃষ্ণা দ্বাদশী তিথি। এই তিথিতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বরাহনগরে শ্রীরঘুনাথ ভট্টাচার্য্যের গৃহে শুভাগমন করেছিলেন। সেই সময় হতে অদ্যাবধি প্রতিবৎসর ঐ তিথিতে সেই শুভাগমন স্মরণোৎসব হয়ে থাকে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীরঘুনাথ ভট্টাচার্য্যকে ভাগবতাচার্য্য পদবী দিয়েছিলেন, সেইদিন হতে তিনি ভাগবতাচার্য বলে বিখ্যাত হলেন। বরাহনগরে তাঁর বাসগৃহ শ্রীভাগবতাচার্য্যের পাটবাড়ী বলে বিখ্যাত হল। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীচরণ-রজপুতঃ এই মহাতীর্থ স্থান কলিকাতার অতি সন্নিকটে বরাহনগরে অবস্থিত। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাভূমি, দক্ষিণেশ্বর হতে এর দূরত্ব অতি অল্প। শ্রীভাগবতাচার্য্যের শ্রীপাটবাড়ীতে সুরম্য মন্দিরে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহ বিরাজমান আছেন, শ্রীভাগবতাচার্য্যের প্রতিষ্ঠিত এই শ্রীবিগ্রহদ্বয় এবং অন্যান্য আরও অনেক শ্রীবিগ্রহ সেই সময় হতে সেবিত হচ্ছেন। এই শ্রীভাগবতা-চার্য্যের শ্রীপাটবাড়ীতে অবস্থিত শ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থ মন্দির সারা ভারতের গৌরবস্থল, এতে প্রাচীন হস্তলিখিত দুর্ল্লভ গ্রন্থসমূহের যে সব পাণ্ডুলিপি আছে তা আর কোথাও নাই। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমদ্‌ রামদাস বাবাজী মহারাজ তাঁর সাধন সিদ্ধির শেষের দিনগুলি এই শ্রীভাগবতাচার্য্যের শ্রীপাটবাড়ীতে যাপন করে এই স্থানেই তিনি আত্ম সংগোপন করেন, এই স্থানে তাঁর পবিত্র সমাধি পূজিত হচ্ছে, প্রতিদিন শত শত ভক্ত নর-নারী উহা দর্শন করতে আগমন করেন।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই মত গঙ্গাতীরে গ্রামে গ্রামে ভক্তের মন্দিরে গিয়ে সকলের মনোরথ পূর্ণ করে পুনরায় নীলাচলে আগমন করলেন।"

জামাই

শ্রীসবিতা দাশগুপ্তা

চাটুজ্যে বাড়ীর অন্দরে ব্রতকথার আসর বসেছে। সন্ধ্যার আর দেরী নাই। ঝাড়লণ্ঠনে সামিয়ানায় ও সতরঞ্চিতে আসর সরগরম। গ্রামের মেয়েরা দলে দলে আসতে আরম্ভ করেছে। ব্রতকথা বলবেন শ্যামা-ঠাকরুণ। বয়সে প্রবীণ—জ্ঞানবৃদ্ধা এই মহিলাটি পাড়ায় পাড়ায় ব্রত-কথার মহিমা প্রচার করে বেড়াচ্ছেন সারা জীবন ধরে।

—"ব্রতকথার মহিমা তোমরা বুঝবে না তো কে বুঝবে। হিন্দু-কুল-ললনারা ব্রতকথাকে শাস্ত্রবাক্য মনে করবে। সমাজ জীবনে এর ব্যবহার অপরিহার্য্য। ব্রতকথার প্রতি কথাটি অমূল্য। প্রায়ই এই প্রসঙ্গে কত কথাই না বলে আসছি। আজ বলব ষষ্ঠীর কথা। সে হল জামাই ষষ্ঠী।"

শ্যামাঠাকরুণ সকলের পানে তাকিয়ে নিলেন। মুখটা মুছে নিয়ে বললেন—"ষষ্ঠী অনেক রকমের আছে—তার মধ্যে একটা ষষ্ঠী জামাইয়ের আদর আপ্যায়নের জন্য নির্দ্দিষ্ট করা হয়েছে। জামাইকে সম্মান দেখান, তাকে আদর আহ্লাদ জানান, তাকে কেন্দ্র করে পারিবারিক জীবনে আমোদ আহ্লাদ উপভোগ করাই হ'ল এই ষষ্ঠীর উৎসব। জামাই ষষ্ঠীর উৎসব পুরাকাল থেকেই চলে আসছে। সেকালের মুনি-ঋষিরা তাঁদের পারিবারিক জীবনকে মধুময় করবার জন্যে নানা উৎসবের সৃষ্টি করেছেন। মেয়ে-জামাই, ছেলে-বৌ ও নাতি-নাতিনী নিয়ে কত উৎসবই চলে। মেয়ের বিয়ে দিয়ে সে পর হয়ে গিয়েছে তাই এই জ্যৈষ্ঠ মাসের ষষ্ঠীর দিনে মেয়ে-জামাইকে নিয়ে এসে তাদের কেন্দ্র করে একটা উৎসব সৃষ্টি হ'ল। তারাও হ'ল খুসী, বাড়ীর সকলে হ'ল আরও খুসী।"

"বৈদিক যুগে, পৌরাণিক যুগে জামাই ষষ্ঠীর নিদর্শন দুর্লভ নয়। রাজা মহারাজা সমারোহ করে এই উৎসব পালন করতেন। দীর্ঘকাল থেকে ভারতীয় সমাজ-জীবনে জামাই ষষ্ঠী প্রথাটি পারিবারিক উৎসবের অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে।" বলে শ্যামাঠাকরুণ সকলের মুখের দিকে তাকালেন।

সকলেই মন দিয়ে শ্যামাঠাকরুণের ব্রতকথা শুনে যাচ্ছেন। এমন ভাবে কথা বলতে কম মেয়েই পারে। ধর্মপ্রাণা এই মহিলাটির বয়েস হয়েছে যথেষ্ট। সব সময়ই ধর্মগ্রন্থ পাঠ করেন, সংসার চিন্তা ত্যাগ করেছেন। পাড়ায় পাড়ায় ব্রতকথার মহিমা প্রচার করে বেড়াচ্ছেন। যাতে করে মেয়েরা পুরাপন্থী হ'য়ে চলতে পারেন। সেকেলে আদর্শ-পন্থীদের পথ বেছে নিতে পারেন। সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তীর পূত চরিত্র মনে প্রাণে গ্রহণ করতে পারেন।

শ্যামাঠাকরুণ বলতে লাগলেন জামাই ষষ্ঠীর ইতি-কথা। "সেকালের বিবাহ-রীতি, সমাজ-জীবন, দাম্পত্য জীবনের শত শত কথা পুরাণের মধ্যে লিপিবদ্ধ আছে। তখনকার সমাজ-জীবনের সঙ্গে এখনকার সমাজ-জীবনে অনেক পার্থক্য দেখা দিয়েছে। পূজা-পার্বণ, ব্রতকথা, কথকতা, যাত্রা, কীর্ত্তন সমাজ-জীবনে যে প্রভাব বিস্তার করেছে তার তুলনা নাই। সেগুলো এখন যাতে সকলে সুনজরে দেখে সেদিকে দরকার আছে খর দৃষ্টি রাখার।"

জ্যৈষ্ঠ মাসে বাংলাদেশে ফলের অভাব নেই, সহস্র রকমের ফল, মিষ্টি সাজিয়ে জামাইকে খেতে দেওয়া হয়। তাকে ধান দুর্ব্বা দিয়ে আশীর্ব্বাদ করে কপালে চন্দনের ফোঁটা দিয়ে সম্ভাষণ করা হয়। প্রণম্যদের প্রণাম করে যথারীতি প্রণামী দিয়ে জামাইদেরও প্রাথমিক কৃত্য শেষ করতে হয়।

"এই জামাই ষষ্ঠীর উৎসব বিশেষ করে বাঙ্গালীর সমাজ-জীবনে আনন্দের বান ডেকেছে। নব-পরিণীতা দম্পতীকে নিয়ে শুধু এই উৎসব নয়, বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের নিয়েও এই উৎসব করা হয়।

কলকাতায় জামাই ষষ্ঠী উৎসব বাংলার অন্যান্য স্থানের জামাই ষষ্ঠী উৎসবকে ছাড়িয়ে গিয়েছে। রীতিনীতির কিছুটা পার্থক্য দেখা গেলেও মূলে একই। কলকাতায় উৎসবের ঘনঘটা ও আড়ম্বরের ছড়াছড়ি আছে, কিন্তু ধর্মানুষ্ঠানের আঙ্গিক রূপের দিকে কারও তেমন লক্ষ্য নাই। অথচ পল্লীগ্রামে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান পুরামাত্রায় দেখা যায়।"

দীর্ঘ ভাষণের পর শ্যামাঠাকরুণ দম নিলেন। তাঁর বলার যেমন ধরণ গলার স্বরও তেমন মিষ্ট। শুনতে বসলে আর উঠা যায় না।

রাত্রি ক্রমেই বেড়ে চলেছে। গ্রামের নানা বয়সের মেয়েদের যোগদান দেখে তাঁর মন খুসীতে ভরে উঠেছে। তিনি বেশ বুঝতে পেরেছেন যে তাঁর দীর্ঘ বক্তৃতা ও প্রচার কার্য্যের ফলে মেয়েদের মনে একটা নবচেতনা দেখা দিয়েছে। সমাজ-জীবনে এদের প্রভাব অত্যন্ত বেশী। সমাজ-জীবন এই মেয়েরাই গড়তে পারে, ভাঙ্গতেও পারে। কাজেই এদের মধ্যে ব্রতকথার মাধ্যমে দেশের পুরা কীর্ত্তি-কাহিনী প্রচলিত করলে সমাজের ভাঙ্গনের মুখে একটা বাঁধ দেওয়া হয় মাত্র।

শ্যামাঠাকরুণ বলতে আরম্ভ করলেন—"জামাই ষষ্ঠীর ব্রতকথা অজস্র রকমের আছে,—মেয়ে-জামাই, সে রাজা মহারাজার,—বড়লোকের, গরীব লোকের এবং অতি সাধারণ ঘরোয়া ঘটনার মধ্যে দিয়ে কেমন করে তা পল্লবিত হয়েছে সেই সব কাহিনী—এই অজস্র কাহিনী শুনবার মত। যেমন রাজা ও রাণীর কথা। তাদের বিয়ের ঘটনা; বিয়ের পূর্ব্বরাগের ঘটনা ও তার বিষময় ফলের ঘটনা; রাজকুমার ও রাজ-কুমারী স্বেচ্ছায় বিয়ে করেছে বাপ-মা আত্মীয়-স্বজনের অমতে। তার

পরিণাম কাহিনী নানাভাবে নানাজনের মুখে মুখে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই সব কাহিনীই ব্রতকথার মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে পরিবেশন করা হয়।”

অজস্র ব্রতকথা শুনিয়ে চলেছেন শ্যামাঠাকরুণ, জামাই ষষ্ঠীর দিনে এই সব ব্রতকথা শুনেও আনন্দ হয়, শুনিয়েও আনন্দ হয়। এর ফলও ফলে ভাল ভাবে নানা দিক দিয়ে।

সন্ধ্যায় নৌকা ভাষাণ পর্ব্ব, নদীতে বাঁচখেলা, পুকুরে কলার ছোট ছোট নৌকা তৈরী করে ফুল, তৈল প্রদীপ অথবা মোমবাতি দিয়ে সাজিয়ে জলে ভাসান ইত্যাদি সব দেখবার মত। দলে দলে ছেলে-মেয়েরা এই উৎসব দেখবার জন্য ভীড় করে। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন পারিবেশ দেখা যায়। বাঙ্গালীর বড় আদরের ও আনন্দের পর্ব্ব এই জামাই ষষ্ঠী।

কলকাতায় বৃদ্ধেরাও জামাই ষষ্ঠী করতে যান। একই বাড়ীর তিন পুরুষে চলেছেন শ্বশুর বাড়ী; এইসব দৃশ্য লক্ষ্য করলে বড়ই আনন্দ জাগে মনে। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার এই উৎসব লক্ষ্য করবার মত। এই উৎসবের দিন তারা আগে থেকেই গুণতে থাকে।

শ্যামাঠাকরুণ বলতে আরম্ভ করলেন জামাই ষষ্ঠীর উদ্দেশ্য ও তার ইতিহাস। পুরাকালে কিভাবে এই ষষ্ঠীর দিন জামাইকে ডেকে এনে সাদর সম্ভাষণ জানান হত। এখন কেমন ধারা হয়, এই সব এক এক অঞ্চলের রকমফের সেই অঞ্চলের ঐতিহ্য বহন করে চলেছে, কিন্তু সবই এক। এই উৎসব বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্য নিয়ে চলেছে। এই উৎসবের মধ্যে তার সংস্কৃতি, তার সভ্যতা, তার ঐতিহ্য সব কিছুই রয়েছে। সুতরাং বঙ্গ সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার প্রয়োজন সব চেয়ে আগে।

অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত চলল এই সব ব্রতকথা। তারপর কৃষ্ণা ঠাকরুণ দেবী বন্দনা করে প্রণাম করলেন। সকলেই তাঁর দেখাদেখি প্রণাম করলো। এই উৎসব মুখর রজনীর পরিসমাপ্তি সকলের মুখে আনন্দ জুগিয়েছে বলে মনে হল।

ষষ্ঠী তিথি অনেক আছে বিভিন্ন নামে। শুক্লপক্ষের প্রতি ষষ্ঠী তিথিতে একটা না একটা উপলক্ষ্য লেগেই আছে। উৎসবে শুক্লা ষষ্ঠীর বহুল প্রচলন দেখা যায়, কারণ এই দিনটি উৎসব সূচক। শুক্লা ষষ্ঠী থেকে পূর্ণিমা তিথি পর্য্যন্ত সব দিনই উৎসবের অনুকূল। বহু রকমের ষষ্ঠী উৎসবের মধ্যে জামাই ষষ্ঠী সবচেয়ে আনন্দদায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। নানাদিক দিয়ে এর গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে বলেই এই দিনের এত সমারোহ।

জামাই ষষ্ঠীর দিনে পারিবারিক মঙ্গল অনুষ্ঠানের অনেক রকম বিধি বিধানের নির্দেশ আছে। কাজেই সমাজ-জীবনে এর প্রত্যক্ষ ফল দেখা যায়।

—"মানবাত্মার মহত্ত্ব যে জানেনা, স্বাবলম্বন-শক্তি তাহার আসেনা। এ জগতে মানুষ আপনার ঘর আপনি রচনা করে। তুমি বড় হইয়া দাঁড়াইবে কি ছোট হইয়া থাকিবে, তাহা তোমারই হাতে। বিঘ্ন বাধা, পাপ প্রলোভন, জীবনের সমস্যা, সকলেরই পথে উপস্থিত হয়। তাহার উপরে উঠা বা নীচে পড়িয়া যাওয়া, ইহার উপর বড় বা ছোট হওয়া নির্ভর করে।"

—শিবনাথ শাস্ত্রী

ঋতুসংহার-কাব্যে গ্রীষ্ম

অধ্যাপক শ্রীজিতেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, কাব্যতীর্থ, এম্ এ

ভারতবর্ষের জন-প্রিয় জাতীয় মহাকবি কালিদাসের কোনও নির্ভর-যোগ্য জীবনী নাই। শুধু কালিদাস কেন, প্রাচীন ভারতের অধিকাংশ কবি, সাহিত্যিক ও মনীষী সম্বন্ধেই এই কথা বলা যাইতে পারে। তাঁহারা অমর মহা-মানব। তাঁহাদের যশ বিশেষ কোনও দেশ বা কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে। তাঁহারা সমগ্র বিশ্বের সম্পদ। তাঁহাদের অমূল্য চিন্তা-ধারা সর্ব্বদেশের ও সর্ব্বকালের মানব-মনকে পরিচালিত করিতেছে। বিশ্বের কল্যাণ-কামনাই তাঁহাদের জীবনের ব্রত। সরল অনাড়ম্বর জীবন-যাপন ও উচ্চ-চিন্তা—ইহাই তাঁহাদের জীবনের আদর্শ। সেইজন্য তাঁহাদের ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে তাঁহারা চিরদিনই উদাসীন। তাঁহাদের রচনাই তাঁহাদের শ্রেষ্ঠ পরিচয়। তাঁহাদের দৈনন্দিন জীবনের চিত্রাবলীর মধ্যে তো তাঁহাদের আসল স্বরূপের সন্ধান পাওয়া যাইবে না। বিশ্ব-কবি রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলিয়াছেন—

"বাহির হইতে দেখো না এমন ক'রে,
আমারে দেখো না বাইরে,
আমারে পাবে না আমার দুখে ও সুখে,
আমার বেদনা খুঁজো না আমার বুকে,
আমারে দেখিতে পাবে না আমার মুখে,
কবিরে খুঁজিছ যেথায় সেথা সে নাই রে।

মানুষ আকারে বদ্ধ যে জন ঘরে,
ভূমিতে লুটায় প্রতি নিমেষের তরে,
যাহারে কাঁপায় স্তুতি-নিন্দার জ্বরে,
কবিরে পাবে না তাহার জীবন-চরিতে।''

বিদ্যা বিনয় দান করে। যথার্থ জ্ঞানী যিনি, তিনি বিনয়ের অবতার হইয়া থাকেন। নিউটনের মত বৈজ্ঞানিকই অসঙ্কোচে বলিতে পারেন—"অনন্ত জ্ঞান-সমুদ্র আমার সম্মুখে অনাবিষ্কৃত পড়িয়া রহিয়াছে। জ্ঞান-সমুদ্রের তীরে আমি কয়েকটি উপল-খণ্ড মাত্র সংগ্রহ করিয়াছি।'' কবি কালিদাসও সেইরূপ অসাধারণ কবিত্ব-শক্তির অধিকারী হইয়াও বলিতে পারিয়াছেন—"আমি অল্প-বুদ্ধি হইয়াও কবি-যশঃপ্রার্থী ; মাদৃশ তনু-বাগ্-বিভব কবির পক্ষে কাব্য-রচনায় প্রবৃত্ত হওয়া চপলতা মাত্র। সামান্য ভেলার সাহায্যে দুস্তর সাগর অতিক্রম করিতে অভিলাষী ব্যক্তির ন্যায়, দীর্ঘ-কায় ব্যক্তির লভ্য ফল সংগ্রহ করিতে উর্দ্ধ-বাহু লোভী বামনের ন্যায়, আমাকে আমার এই প্রচেষ্টার জন্য উপহাসের পাত্র হইতে হইবে।"

"ক্ব সূর্য্য-প্রভবো বংশঃ ক্ব চাল্পবিষয়া মতিঃ।
তিতীর্ষুর্দুস্তরং মোহাদ্ উড়ুপেনাস্মি সাগরম্॥
মন্দঃ কবি-যশঃ-প্রার্থী গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম্।
প্রাংশু-লভ্যে ফলে লোভাদ্ উদ্বাহুরিব বামনঃ॥
রঘুণামন্বয়ং বক্ষ্যে তনু-বাগ্-বিভবোঽপি সন্।
তদ্গুণৈঃ কর্ণমাগত্য চাপলায় প্রণোদিতঃ॥''

এইরূপ বিনয়-নম্র নিরভিমান কবির পক্ষে আত্মপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে স্বরচিত কাব্য ও নাটকে আত্ম-পরিচয় প্রদান করা সম্পূর্ণ অসম্ভব ও অস্বাভাবিক। সেইজন্য দেখিতে পাই, সেকালে যদিও সংস্কৃত নাটকের প্রারম্ভে প্রস্তাবনায় কবির পক্ষে সূত্রধারের মুখে আপনার নাম-ধাম-গোত্র

ও পূর্ব্বপুরুষগণের পরিচয় জানাইবার একটা রীতি ছিল, তথাপি কালিদাস তাঁহার নাটকে নিজের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নীরবতা অবলম্বন করিয়াছেন।

"মালবিকাগ্নিমিত্র" নাটকে তিনি জনৈক নবীন নাট্যকাররূপে নিজের পরিচয় দিয়াছেন মাত্র।

["প্রথিতযশসাং ধাবক-ভাস-সৌমিল্ল-কবিপুত্রাদীনাং (কবিরত্নাদীনাং) কিং কৃতো (কথং) বহুমানঃ ?"—মালবিকাগ্নিমিত্রম্।]

"শকুন্তলা" নাটকেও কবি কেবলমাত্র "অভিনব নাটক"-রূপে স্ব-নাটকের পরিচয় দিয়াছেন।

["অদ্য খলু কালিদাস-গ্রথিত-বস্তুনা অভিজ্ঞান-শকুন্তলা-নামধেয়েন নবেন নাটকেনোপস্থাতব্যমস্মাভিঃ।"—অভিজ্ঞান শকুন্তলম্।]

এরূপ ক্ষেত্রে কবির লেখার মধ্যে তাঁহার জীবন-কাহিনীর কোনও উপাদান সংগ্রহের আশা দুরাশা মাত্র। অতএব কবির জীবন-কাহিনীর জন্য আমাদের প্রচলিত জনশ্রুতির উপরই নির্ভর করিতে হয়। এই জনশ্রুতির কোনটা বিশ্বাসযোগ্য, কোনটা বা বিশ্বাসযোগ্য নহে। মানব-মনের উর্ব্বরা কল্পনা-শক্তি সেই অবিশ্বাস্য জন-শ্রুতির জন্য দায়ী।

শোনা যায়, কালিদাস প্রথম জীবনে অতিশয় নির্ব্বোধ ও নিরক্ষর ছিলেন। তিনি নাকি যে বৃক্ষ-শাখায় উপবেশন করিয়াছিলেন, সেই শাখাই কুঠারের সাহায্যে কর্ত্তন করিতে গিয়াছিলেন। ঘটনাচক্রে এক পরমা-সুন্দরী বিদুষী রাজকন্যার সহিত এই মহামূর্খের বিবাহ হয়। বরের নির্বুদ্ধিতার কথা শীঘ্রই প্রকাশ হইয়া পড়িল। নব-বিবাহিতা রাজকন্যা জানিতে পারিলেন, তাঁহার মূর্খ স্বামী সামান্য "উষ্ট্র" কথাটিও বিশুদ্ধভাবে উচ্চারণ করিতে পারেন না। তিনি একবার বলেন "উষ্ট"

একবার বলেন, "উট্র"। রাজকন্যা স্বয়ং বিদুষী। তিনি নিরতিশয় ক্রুদ্ধা হইয়া এই নির্ব্বোধ স্বামীকে প্রত্যাখ্যান করিলেন।

কালিদাস বিষণ্ণ মনে গৃহত্যাগ করিয়া জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীর আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। বহু কৃচ্ছ্র-সাধনের পর তপস্যা-বলে তিনি বাগদেবাকে সন্তুষ্টা করিয়া কবিত্ব-শক্তির অধিকারী হন। কেহ কেহ বলেন, কালীমাতার প্রসাদে তিনি কবি হন; তাই তাঁহার নাম—কালিদাস।

যাহা হউক, কালিদাস গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন-পূর্ব্বক রুদ্ধ-দ্বার কক্ষে করাঘাত করিতে লাগিলেন। ভিতর হইতে তাঁহার বিদুষী স্ত্রী প্রশ্ন করিলেন—"কস্ত্বম্? কিমর্থমাগতোঽসি?—আপনি কে? কিজন্য এখানে আসিয়াছেন?" কালিদাস উত্তর দিলেন—"অস্তি কশ্চিদ্ বাগবিশেষঃ।—আমার বিশেষ কিছু কথা বলিবার আছে।" স্ত্রী দ্বার মুক্ত করিয়া দেখিতে পাইলেন, তাঁহার স্বামী কালিদাস সম্মুখে দণ্ডায়মান। স্বামীকে বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় কথা বলিতে শুনিয়া ও তিনি কবিত্ব-শক্তির অধিকারী হইয়াছেন জানিতে পারিয়া, স্ত্রী তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার মানসে বলিলেন, কালিদাস যদি 'অস্তি', 'কশ্চিৎ', 'বাক্' ও 'বিশেষঃ'—এই চারিটি পদ দিয়া চারিটি কাব্য রচনা করিতে পারেন, তবেই তিনি তাঁহাকে স্বামী বলিয়া স্বীকার করিবেন। কালিদাস বলিলেন—"তথাস্তু।"

কালিদাস এইরূপে স্ত্রীর অনুরোধে উক্ত চারিটি পদ দিয়া চারিটি কাব্য রচনা করিলেন; কাব্যগুলির নাম যথাক্রমে—কুমার-সম্ভব, মেঘদূত, রঘুবংশ ও ঋতুসংহার।৫ সেইজন্য এই চারিটি গ্রন্থের প্রথম শ্লোকের প্রারম্ভে যথাক্রমে উক্ত চারিটি পদ দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন—

কুমার-সম্ভবের প্রথম শ্লোক—

অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা
হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ।
পূর্ব্বাপরৌ তোয়নিধী বগাহ্য
স্থিতঃ পৃথিব্যা ইব মানদণ্ডঃ ॥

মেঘদূতের প্রথম শ্লোক—

কশ্চিৎ কান্তা-বিরহ-গুরুণা স্বাধিকার-প্রমত্তঃ
শাপেনাস্তংগমিত-মহিমা বর্ষ-ভোগ্যেন ভর্ত্তুঃ।
যক্ষশ্চক্রে জনক-তনয়া-স্নান-পুণ্যোদকেষু
স্নিগ্ধ-চ্ছায়া-তরুষু বসতিং রামগির্য্যাশ্রমেষু ॥

রঘুবংশের প্রথম শ্লোক—

বাগর্থাবিব সংপৃক্তৌ বাগর্থ প্রতিপত্তয়ে।
জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্ব্বতী-পরমেশ্বরৌ ॥

ঋতুসংহারের প্রথম শ্লোক—

বিশেষ-সূর্য্যঃ স্পৃহণীয়-চন্দ্রমাঃ
সদাবগাহ-ক্ষত-বারি-সঞ্চয়ঃ।
দিনান্তরম্যোঽভ্যুপশান্ত-মন্মথো
নিদাঘকালঃ সমুপাগতঃ প্রিয়ে ॥

ঋতুসংহারের প্রথম শ্লোকটির প্রথম চরণ—"বিশেষ-সূর্য্যঃ স্পৃহণীয়-চন্দ্রমাঃ"—এর পরিবর্ত্তে কেহ কেহ "প্রচণ্ড-সূর্য্যঃ স্পৃহণীয়-চন্দ্রমাঃ" পাঠ করেন। তাঁহাদের মতে কালিদাসের স্ত্রী কালিদাসকে 'অস্তি', 'কশ্চিৎ' ও 'বাক্'—মাত্র এই তিনটি পদ দিয়া তিন খানি কাব্য রচনা করিতে বলিয়াছিলেন। তাঁহাদের মতে ঋতুসংহার কাব্যখানি কালিদাসের রচনা নহে।

কবির পরিণত বয়সের রচনা নহে বলিয়া অনেকে ঋতুসংহার-কাব্যকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। কিন্তু এরূপ আচরণ—অট্টালিকাকে সমাদর করিয়া তাহার একমাত্র অবলম্বন ভূমি-প্রোথিত ভিত্তি স্তম্ভকে অগ্রাহ্য করার নামান্তর মাত্র। কারণ, অপরিণত কবি-কৃতিরও একটা সার্থকতা আছে। অপরিণত কবি-মনের রচনা ভাবীকালের সফলতার স্বাক্ষর বহন করিয়া আনে। অপরিণত বুদ্ধির রচনাই ক্রমশঃ কবির জীবনকে পরিপূর্ণতার পরিণতিতে সার্থক করিয়া তোলে। ঋতুসংহার-কাব্যে যদি কোনও অপূর্ণতা থাকে, কোনও অস্বাভাবিক আতিশয্য থাকে, কোনও পুনরুক্তি দোষ থাকে—তাহা কোন প্রকারেই অবহেলার সামগ্রী নহে। কারণ, ঋতুসংহারের ভিত্তি-প্রস্তরের উপরই কবির অমর কাব্যে কুমারসম্ভব-মেঘদূত-রঘুবংশের প্রতিষ্ঠা। কবি-মনের পরিণতি কি ভাবে বিকাশ লাভ করিয়াছে—তাহা আলোচনা করিবার উপকরণ এই কাব্যের মধ্যেই পাওয়া যায়। এই দিক দিয়াও ঋতুসংহার কাব্যের উপযোগিতা রহিয়াছে। এই কাব্যে কবির আত্মপ্রকাশ তথাকথিত ত্রুটি-পূর্ণ হইলেও, কবির দৃঢ় ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ইহার মধ্যে স্বীকার করিতেই হইবে। কবির বর্ণনীয় বস্তুর স্বকীয়তা, উপমা-প্রয়োগের বিশিষ্টতা, ভাষার অনবদ্য মাধুর্য—সর্বত্রই মহাকবি কালিদাসের উত্তর-কালীন রচনা-ভঙ্গির বিশেষত্বের ইঙ্গিত সুপরিস্ফুট। কবি-মনের সহজ-সরল-সাবলীল প্রকাশের ব্যাকুলতা যেন সর্বত্রই পরিব্যাপ্ত, প্রত্যূষের অরুণাভ কনক-কিরণ কবি-প্রতিভার মধ্যাহ্ন-ভাস্করের ভাস্বর-জ্যোতির পরমতম-সম্ভাবনাকে বুঝি দিগ্বিদিকে বিকীর্ণ করিয়া দিতেছে। শ্রীঅরবিন্দ যথার্থই বলিয়াছেন—"In the Seasons, Kalidasa's personality is distinctly perceived as well as his main characteristics, his force of vision, his

architecture of style, his pervading sensuousness, the peculiar temperament of his similes, his characteristic strokes of thought and imagination, his individual and inimitable cast of description. Much of it is as yet in a half-developed state, crude consistence, not yet fashioned with the masterly touch he soon manifested, but Kalidasa is there quite as evidently as Shakespeare in his early work, the Venus and Adoris or Lucrece."

কবি তাঁহার ঋতুসংহার-কাব্য গ্রীষ্মঋতুর বর্ণনা দিয়া আরম্ভ করিয়াছেন। গ্রীষ্মকাল বলিতে সেকালে জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসকে বুঝাইত—এ কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তখনকার দিনে বৎসর আরম্ভ হইত হেমন্ত ঋতু দিয়া অগ্রহায়ণ মাসে। এক্ষণে কিন্তু অগ্রহায়ণ মাসে বর্ষ আরম্ভ হয় না; এক্ষণে বর্ষারম্ভ হয় বৈশাখ মাসে। এবং বৈশাখ মাস গ্রীষ্মকালের আরম্ভ বলিয়াও পরিগণিত হইয়া থাকে।

কোন্ সময় হইতে বৈশাখ মাস বৎসরের প্রথম মাস বলিয়া গণ্য হইল, তাহার সঠিক বিবরণ জানা যায় না। অনেকে বলেন, বৌদ্ধ-যুগ হইতেই ইহার প্রবর্ত্তন। ভগবান বুদ্ধদেব বৈশাখী পূর্ণিমায় আবির্ভূত হন। বৈশাখী পূর্ণিমায় বুদ্ধদেবের জন্ম-মহোৎসব ও মহাপরিনির্ব্বাণ-উৎসব বৌদ্ধযুগে সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হইত। জৈন তীর্থঙ্করগণের জন্মোৎসব চৈত্র-বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসেই অনুষ্ঠিত হইত। এই সকল কারণে বৌদ্ধ-যুগ হইতেই বৈশাখ মাস বৎসরের প্রথম মাসের মর্য্যাদা পাইয়া আসিতেছে—এইরূপ মনে করা যাইতে পারে।

বিভিন্ন স্মৃতিশাস্ত্রে ও পুরাণের মধ্যেও দেখা যায়, বৈশাখ

মাস অন্য সকল মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও পবিত্রতম বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে বলা হইয়াছে—"বৈশাখ মাস শ্রেষ্ঠ মাস। এই মাসে স্নান, জপ, হোম, দান, শ্রাদ্ধাদি করিলে অক্ষয় ফল-লাভ হয়।"

"সর্ব্বেষামেব মাসানাং বৈশাখঃ প্রবরঃ স্মৃতঃ।
পুরা হরিমুখে রাজন্! শ্রুতমেতন্ন সংশয়ঃ॥
তত্র স্নানং জপো হোমঃ শ্রাদ্ধং দানাদি যৎকৃতম্।
তৎ সর্ব্বং ভূপতিশ্রেষ্ঠ! সত্যমক্ষয়মুচ্যতে॥
একতঃ সর্ব্বতীর্থানি সর্ব্বযজ্ঞাঃ সদক্ষিণাঃ।
ভূপ! বৈশাখমাসস্য কোট্যংশেনাপি ন সমাঃ॥"

"কৃত্য-তত্ত্ব" গ্রন্থে বলা হইয়াছে—"কার্ত্তিক, মাঘ ও বৈশাখ মাসে প্রত্যহ প্রাতঃস্নান করা বিধেয়। উক্ত মাসে হবিষ্যান্ন গ্রহণ পূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্য পালন করিলে মহাপাতক নাশ হয়।"

"তুলা-মকর-মেষে চ প্রাতঃস্নানং বিধীয়তে।
হবিষ্যং ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ মহাপাতকনাশনম্॥"

"বৈষ্ণবামৃত" গ্রন্থে জানা যায়—"বৈশাখ মাসে প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করিলে অর্দ্ধপ্রসূত লক্ষ গাভী-দানের পুণ্য লাভ হয়।"

"গবামর্দ্ধপ্রসূতানাং লক্ষং দত্ত্বা তু যৎ ফলম্।
তৎ ফলং লভতে রাজন্! মেষে স্নাত্বা তু জাহ্নবীম্॥"

বর্ত্তমান কালেও দেখা যায়, বৈশাখ মাসে অনেকেই প্রত্যহ গঙ্গাস্নান, বার-ব্রত, শিবপূজা, দানাদি ধর্ম্মকর্ম্ম করিয়া থাকেন। বঙ্গদেশে পয়লা বৈশাখ তারিখে একটি লৌহ-শলাকা-বিদ্ধ আম্র তাম্র-পাত্রে স্থাপন করিয়া কালকুমারদেবের পূজা হয়। পয়লা বৈশাখে দোকানে দোকানে হাল-খাতার উৎসব হয়। এইভাবে বৈশাখ মাস সর্ব্বদিক দিয়াই বিশেষ

উল্লেখযোগ্য ও পবিত্র মাস বলিয়া, এই মাসই বর্ষারম্ভ ও গ্রীষ্মারম্ভের পক্ষে উপযুক্ত মাস বলিয়া বিবেচিত হইয়া আসিতেছে।

বিভিন্ন যুগে বিশেষ বিশেষ মাস হইতে বর্ষ-গণনার প্রথা শুধু যে ভারতীয় জ্যোতিষ শাস্ত্রেই ঘটিয়াছে—তাহা নহে। এইরূপ ঘটনা পাশ্চাত্য দেশের বর্ষ-গণনাতেও পরিদৃষ্ট হয়। আধুনিক কালে আমরা 'জানুয়ারী' মাসকেই ইংরাজী বৎসরের প্রথম মাস বলিয়া জানি। কিন্তু প্রাচীনকালে 'জানুয়ারী' মাসকে বৎসরের প্রথম মাস বলিয়া গণ্য করা হইত না। এমন কি, সুপ্রাচীন যুগে ইউরোপীয় বর্ষচক্রের হিসাবে 'জানুয়ারী' ও 'ফেব্রুয়ারী' মাসের অস্তিত্বই ছিল না। সে সময়ে 'মার্চ' মাসই বৎসরের প্রথম মাস ছিল এবং বৎসরে বার মাসের পরিবর্তে 'মার্চ' হইতে 'ডিসেম্বর' পর্যান্ত—এই দশটি মাত্র মাস ছিল।

প্রাচীনকালে রোম যাহা করিত, ইউরোপের অন্যান্য দেশ তাহাই অনুসরণ করিত। রোম-সম্রাট্ রোমিউলাস্ (Romulus) বৎসরকে দশ মাসে ভাগ করেন ও তাহাদের নাম দেন—মার্চ, এপ্রিল, মে, জুন, কুইন্‌টিলিস্ (Quintilis বা পঞ্চম মাস), সেক্সটিলিস্ (Sextilis বা ষষ্ঠ মাস), সেপ্টেম্বর (বা সপ্তম মাস), অক্টোবর (বা অষ্টম মাস), নভেম্বর (বা নবম মাস) ও ডিসেম্বর (বা দশম মাস)।

পরবর্ত্তী যুগে রোমে জুলীয়াস্ বর্ষপঞ্জী (Julian Calendar) প্রচলিত হয়। তদনুসারে পঞ্চম মাস 'কুইন্‌টিলিস্'-এর নাম পরিবর্ত্তন করিয়া রোম সম্রাট্ জুলিয়াস সীজারের (Julius Caesar) নামানুসারে 'জুলাই' (July) ও ষষ্ঠ মাস 'সেক্সটিলিস্'-এর নাম পরিবর্ত্তন করিয়া সম্রাট্ আগাষ্টাসের (Augustus) নামানুসারে 'আগষ্ট' (August) নাম রাখা হয়।

এই দশমাস বিশিষ্ট বৎসরে মোট ৩০৪ দিনে বর্ষ-গণনা হইত। কিন্তু সূর্য্যের অয়ন-চক্রের বার্ষিক-কাল-পরিমাণ অপেক্ষা রোমিউলাস্-প্রবর্ত্তিত বৎসরের পরিমাণ প্রায় ৬২ দিন কম। তাই বৎসরের দিবস সংখ্যার পরিমাণের অল্পতা দূর করিবার জন্য রোম-সম্রাট নিউমা পম্পিলিয়াস্ (Numa Pompilius)-এর রাজত্বকালে দশ-মাস বিশিষ্ট বৎসরের প্রথমে ও শেষে একটি করিয়া মাস যুক্ত করিয়া দেওয়া হইল। রোমক দেবতা জেনাস্ (Janus)-এর নামানুসারে প্রথম মাসটির নাম দেওয়া হইল জানুয়ারী (January), এবং শেষ মাসটির নাম হইল ফেব্রুয়ারী।

নিউমার বর্ষপঞ্জী খৃঃ পূঃ ৪৫২ অব্দে সংশোধিত হয় এবং তখন হইতে ফেব্রুয়ারী মাসকে বৎসরের দ্বিতীয় মাস হিসাবে গণ্য করা হয়। এই প্রথা বর্ত্তমানেও চলিয়া আসিতেছে।

কিন্তু বৎসরের দিবস-সংখ্যা লইয়া সমস্যার সমাধান সহজে হইল না। দশ মাসে যখন বৎসর ছিল তখন বৎসরে মাত্র ৩০৪ দিন ছিল। যখন দুইটি মাস যুক্ত করিয়া বার মাসে বৎসর হইল, তখনও প্রথম মাস ২৯ দিনে, দ্বিতীয় মাস ৩০ দিনে—এই ভাবে এক মাস অন্তর অন্তর ২৯ ও ৩০ দিনের হিসাবে, এক বৎসরে ৩৫৪ দিন হইল। কিন্তু যুগ্ম-সংখ্যা অশুভ সূচক—এই রোমীয় বিশ্বাসের জন্য একদিন যোগ করিয়া ৩৫৫ দিনে বৎসর গণনা হইতে লাগিল। পরবর্ত্তী "গ্রেগরীয় যুগে" নিউমার বর্ষপঞ্জী সংশোধিত হইলে ৩৬৫¼ দিনে (সূক্ষ্ম হিসাবে ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ৪৬ সেকেণ্ড) বৎসর গণনা প্রবর্ত্তিত হয়। এই ব্যবস্থা আজিও চলিয়া আসিতেছে।

শুধু ভারতবর্ষে ও ইউরোপে কেন, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রাচীন

কালে, এমন কি বর্ত্তমান কালেও নব-বর্ষ-গণনা এক এক সময়ে হইয়া থাকে।

বসন্তের অবসানে নিদাঘের সুরু। চৈত্রের অবসানে নব-বর্ষের সূচনা। "বর্ষ হয়ে আসে শেষ—দিন হয়ে এল সমাপন—চৈত্র অবসান" —তাহার পরই নব-বর্ষের নবীন উন্মাদনা মানব-মনকে উৎসাহে-উদ্দীপনায় পূর্ণ করিয়া তোলে।

বসন্তের এক প্রান্তে শীত, অপর প্রান্তে গ্রীষ্ম। ইহারা যেন দুইটি সখা। প্রকৃতি ইহাদের এক প্রকার। উভয়েই মানবকে ক্লেশ দিতে সিদ্ধ-হস্ত। অপরকে দুঃখ দেয় যাহারা—তাহারা নাকি চিরদিনই দীর্ঘজীবী। তাই শীতের রাত্রি দীর্ঘতর—গ্রীষ্মের দিবসও তাই।

"গ্রীষ্মকালে দিবা দীর্ঘং শীতকালে তু শর্ব্বরী।
পরোপতাপিনঃ সর্ব্বে প্রায়শো দীর্ঘজীবিনঃ॥"

নিদাঘের প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের তাপ-দগ্ধ ব্রহ্মাণ্ড রুদ্র-ভৈরবের ভয়ঙ্কর ভ্রূকুটির আভাস দেয়।

"হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ!
জ্বলিতেছে সম্মুখে তোমার
লোলুপ চিতাগ্নি-শিখা, লেহি লেহি বিরাট অম্বর,
নিখিলের পরিত্যক্ত মৃত স্তূপ বিগত বৎসর
করি, ভস্ম-সার
চিতা জ্বলে সম্মুখে তোমার।"

"ধূলায় ধূসর রুক্ষ উড্ডীন পিঙ্গল জটা-জাল" মেলিয়া কাল-বৈশাখীর ছায়া-মূর্ত্তি ছুটিয়া আসে—

"কি ভীম অদৃশ্য নৃত্যে মাতি ওঠে মধ্যাহ্ন আকাশে।"

তাহারই মাঝে কবির উৎসাহ-বাণী—

"মুছে যাক্ সব গ্লানি, ঘুচে যাক্ জরা,
অগ্নি-স্নানে দেহে প্রাণে শুচি হোক ধরা।"

রুদ্রের আহ্বান বর্তমান কালের বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ও প্রাচীনকালের মহাকবি কালিদাসের কবি-মানসে কত বিচিত্র ভাবের আলোড়ন তুলিয়াছে! গ্রীষ্ম-বর্ণনার প্রারম্ভে ঋতুসংহার-কাব্যে আমরা পাঠ করি—

বিশেষ-সূর্য্যঃ স্পৃহনীয়-চন্দ্রমাঃ
সদাবগাহক্ষতবারিসঞ্চয়ঃ।
দিনান্তরম্যোঽভ্যুপশান্তমন্মথো
নিদাঘকালঃ সমুপাগতঃ প্রিয়ে॥

নিদাঘে মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের প্রচণ্ডতা, দিবসের পরিণাম-রমণীয়তা ও রাত্রিকালীন চন্দ্রের স্নিগ্ধ কমনীয়তা ইহাকে বৈচিত্র্য দান করে। সরোবরের বারিরাশি নিরন্তর অবগাহনের ফলে মলিন। গ্রীষ্মাধিকে অতনুর প্রভাব প্রকৃতির রাজ্য হইতে তিরোহিত।

প্রকৃতির রাজ্যে অতনুর প্রভাব না থাকিলেও মানবের মনোরাজ্যে পঞ্চশরের প্রভাব অপ্রতিহত। হংস-গমনা বিলাসিনীগণের অলক্তক-রাগ-রঞ্জিত চরণের নূপুর-নিক্কণ প্রতি পদক্ষেপে মানব-চিত্তে অনুরাগের সঞ্চার করে।

সুরভিত মনোহর হর্ম্ম্যতল, প্রিয়া-মুখোচ্ছিষ্ট সাধু, তন্ত্রি-বাদ্য-সহযোগে সঙ্গীত-ধারা—ইহাই ত গ্রীষ্মকালের সম্পদ!

তাল-ব্যজন-সমুদ্ভূত চন্দন-বাসিত পবন-হিল্লোল, বল্লকীর কল-কাকলি, কর্দ্দমপূর্ণ জলাশয়, তরল চন্দন, চন্দ্রিকা-সমুদ্ভাসিতা রজনী—গ্রীষ্মকালে

ইহাই ত সাধারণের উপভোগের বস্তু! কোথাও বিচিত্র "জলযন্ত্র-গৃহ" হইতে শীতল জলধারা ফোয়ারার মত ছড়াইয়া পড়ে। কোথাও চন্দ্র-কান্তাদি বিবিধ মণি হইতে জল-ধারা ক্ষরিত হয়।

নিশাঃ শশাঙ্কঃ ক্ষতনীররাজয়ঃ
ক্বচিদ্‌বিচিত্রং জলযন্ত্রমন্দিরম্।
মণিপ্রকারাঃ সরসঞ্চ চন্দনং
শুচৌ প্রিয়ে যান্তি জনস্য সেব্যতাম্॥

সযৌবনা প্রমদাগণ স্বেদাক্ত দেহ হইতে স্থূল বসন অপসারিত করিয়া সূক্ষ্ম অম্বরে সর্ব্বাংগ আবৃত করে।

নিশীথে শুভ্র হর্ম্ম্যকক্ষে সুখ-প্রসুপ্ত রমণীগণের মুখ-চন্দ্রমা অবলোকন করিয়া চন্দ্রদেবের মনে পড়ে—সে সৌন্দর্য্যের নিকট চন্দ্রিমার সুষমা অকিঞ্চিৎকর; তাই লজ্জায় নিশা-শেষে চন্দ্র পাণ্ডুর বর্ণ ধারণ করে।

সিতেষু হর্ম্ম্যেষু নিশাসু যোষিতাং
সুখপ্রসুপ্তানি মুখানি চন্দ্রমাঃ।
বিলোক্য নির্যন্ত্রণমুৎসুকশ্চিরং
নিশাক্ষয়ে যাতি হ্রিয়ৈব পাণ্ডুতাম্॥

আদিত্য-তাপ-দগ্ধা বসুন্ধরার বক্ষে ধূলিরাজি ঝটিকার তাড়নায় দিঙ্‌মণ্ডল ব্যাপ্ত করে। প্রিয়া-বিচ্ছেদ-দুঃখানল-দগ্ধ পথিকগণের দৃষ্টি সেই ধূলিতে ব্যাহত হয়।

অসহ্যবাতোদ্‌গতরেণুমণ্ডলা
প্রচণ্ডসূর্য্যাতপ-তাপিতা মহী।
ন শক্যতে দ্রষ্টুমপি প্রবাসিভিঃ
প্রিয়াবিয়োগানলদগ্ধমানসৈঃ॥

গ্রীষ্ম-তাপ-তাপিত, তৃষ্ণায়-শুষ্ক-তালু মৃগ-যূথ অঞ্জন-নীল নভো-মণ্ডল-

দর্শনে বনান্তরে জলের মরীচিকায় বিভ্রান্ত হইয়া ধাবিত হয়। বরাহ-সমূহ আয়ত বদনাগ্রভাগ দ্বারা সরোবরের কর্দ্দম খনন করতঃ ভূতলে প্রবেশ করে। হস্তিগণ সরোবর হইতে মৃণাল-সমূহ উত্তোলন করিয়া জল-বিহার-কালে পরস্পরকে আক্রমণ করতঃ বারিরাশি কর্দ্দমাক্ত করিয়া তোলে। সারস ভয়ে পলায়ন করে। মৎস্যগুলি বিপন্ন হইয়া ওঠে।

শীর্ণ-পর্ণ বৃক্ষশাখায় বিহগ-কুল দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে। ক্লান্ত কপি-কুল পার্ব্বত্য-কুঞ্জে বিহার করে। গবয়গুলি জলের অন্বেষণে ইতস্ততঃ বিচরণ করে। সরল-প্রকৃতি করিশাবক কূপ হইতে বারি-উত্তোলনে তৎপর হয়।

শ্বসিতি বিহগবর্গঃ শীর্ণপর্ণদ্রুমস্থঃ
কপিকুলমুপযাতি ক্লান্তমদ্রেনিকুঞ্জম্।
ভ্রমতি গবয়যূথঃ সর্বতস্তোয়মিচ্ছন্
শরভকুলমজিহ্মং প্রোদ্ধরত্যম্বু কূপাৎ॥

রবি-কর-তাপিত ও তপ্ত-ধূলি-দগ্ধ হইয়া কুটিল-গতি ফণধর সর্প অধোমুখে নিঃশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে শত্রুতা ভুলিয়া ময়ূরের পক্ষচ্ছায়ায় বিশ্রাম করে। সবিতার অগ্নি-সম তীক্ষ্ণ-কিরণে ক্লান্ত-শরীর কলাপী তাহার পুচ্ছের অন্তরালে লুক্কায়িত বিষধর সর্পকে বধ করে না।

গ্রীষ্ম-পীড়িত মণ্ডূক কর্দ্দমাক্ত সরোবর হইতে উল্লম্ফন পূর্ব্বক তৃষ্ণার্ত্ত সর্পের ফণায় ছত্রচ্ছায় বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করে। তৃষাতুর ফণধরের শিরোমণির প্রভা রবির প্রভায় দ্বিগুণিত হয়। ভুজঙ্গের চঞ্চল দুইটি জিহ্বা পবন লেহন করে। বিষাগ্নি-সম সূর্য্য-করে উৎপীড়িত সর্প এতাদৃশ গ্রীষ্ম-কাতর হয় যে, দর্দ্দুরকে বধ করিবার উৎসাহ তাহার আর থাকে না।

শুষ্ক-কণ্ঠ কুঞ্জরের বদন-বিবর হইতে শীকর-ধারা নিঃসৃত হয়। জল-পানের আশায় সে দিশাহারা। তখন কি তাহার সিংহকে ভয় করিবার সময়? বিলোল-রসনা কম্পিত-কেশর মৃগরাজ তৃষ্ণা-কাতর হইয়া পরাক্রম

ও উৎসাহ হারাইয়া ফেলে। তাই সুযোগ পাইয়াও গজ-বধ করা তাহার আর হইয়া উঠে না।

তৃষাকুল মহিষীকুলের মুখ-বিবরে ঈষৎ-লোহিত দোদুল্যমান জিহ্বা হইতে সফেন লালা নিঃসৃত হয়। পর্ব্বত-কন্দর হইতে প্রবাহিত জল-রাশি তাহারা গাভীর সহিত একত্রে পান করে।

গ্রীষ্মের আধিক্যে শুষ্ক বায়ুর সংস্পর্শে তরু-পল্লব নীরস, শুষ্ক। দিবাকরের খর-কর-তাপে স্বল্পতোয়া রুক্ষ বনভূমি দর্শকের মনে বিভীষিকার সঞ্চার করে।

বনানীর অভ্যন্তরে লেলিহান-শিখায় কনক-শুভ্র দাবানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। নব-বিকশিত কুসুম্ভ-পুষ্পের মত রক্তিমাভ দাবানল তরু-বিটপ ও লতাগ্রভাগকে আলিঙ্গন করিবার জন্য ব্যাকুল হয়।

বিকচ-নব-কুসুম্ভ-স্বচ্ছ-সিন্দূর-ভাসা
পরুষপবনবেগোদ্ধূতবেগেন তূর্ণম্।
তরু-বিটপ-লতাগ্রালিঙ্গন-ব্যাকুলেন
দিশি দিশি পরিদগ্ধা ভূময়ঃ পাবকেন॥

শাল্মলীর বনে, পরিণত-পত্র বৃক্ষ-শিরে, তরু-কোটরে, সর্ব্বত্র অনিল-সখা অনল বিস্তৃতিলাভ করে। ক্ষেত্রের শস্যরাশি দগ্ধ হইয়া যায়। অনলের স্পর্শে মৃগ-যূথ বিনাশ পায়। বহ্নি-তেজে দগ্ধ-গাত্র গজ-সিংহ-গো-মহিষ হিংসা ভুলিয়া বন্ধুর মত একত্র সমবেত হয়। অগ্নি-দাহে ক্লিষ্ট হইয়া তাহারা স্ব স্ব আবাসভূমি পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বিস্তীর্ণ তীর-ভূমি হইতে নদীর শীতল জলে আশ্রয় গ্রহণ করে।

গজগবয়মৃগেন্দ্রা বহ্নিসন্তপ্তদেহাঃ
সুহৃদ ইব সমেতা দ্বন্দ্বভাবং বিহায়।

হুতবহপরিখেদাদাশু নির্গত্য কক্ষাদ্
বিপুলপুলিনদেশাম্নিম্নগামাশ্রয়ন্তে ॥

নিদাঘে জলাশয়গুলি কমল-কলিত, দিবসগুলি পাটল-সৌরভে রমণীয়। এ সময়ে জল-সিঞ্চন অঙ্গ-সুখকর, চন্দ্র-কিরণ দর্শন-সুখপ্রদ। কবি কামনা করেন, তাঁহার প্রিয়জন নিশীথে প্রিয়ার সহিত প্রাসাদ-শিখরে সুললিত সঙ্গীত-ধারার মাঝে সুখে গ্রীষ্মাবকাশ যাপন করুন।

কমল-বন-চিতাম্বুঃ পাটলামোদ-রম্যঃ
সুখ-সলিল-নিষেকঃ সেব্যচন্দ্রাংশুজালঃ।
ব্রজতু তব নিদাঘঃ কামিনীভিঃ সমেতো
নিশি সুললিত-গীতৈর্হর্ম্ম্যপৃষ্ঠে সুখেন ॥

—পিতার আজ্ঞা সকল সময়েই পালনীয়—তিনি যখন আছেন, তখনও পালনীয়। তিনি যখন স্বর্গে তখনও পালনীয়। কিন্তু পিতা যদি অধর্ম্ম করিতে বলেন, তবে তাহা কি পালনীয়? পিতা, মাতা বা গুরুর আজ্ঞাতেও অধর্ম্ম করা যায় না—কেন না, যিনি পিতা মাতার পিতা মাতা এবং গুরুর গুরু, অধর্ম্ম করিলে তাঁহার বিধি লঙ্ঘন করা হয়।"

—বঙ্কিমচন্দ্র

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

১০

তিন জনেই রবিবারের বৈঠক জ'মে উঠেছিল।

যে বৈঠকে রসের চর্চা হয়, তথায় বৈঠকীর সংখ্যা গৌণ, রসবেত্তার সংখ্যাই মুখ্য। অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট; কিন্তু বৈঠক নষ্ট করবার জন্য অধিক অরসিকের প্রয়োজন হয় না, ব্যক্তিত্ব প্রবল হ'লে একজনই যথেষ্ট।

ধরা যাক, সময় সায়াহ্ন; প্রশস্ত ফরাসের উপর সঙ্গীতের আসর বসেছে, কাঁধের উপর তানপুরা ফেলে গায়ক নিবিষ্ট চিত্তে ভূপালী রাগের কর্তব করছেন, শ্রোতারা বিমুগ্ধ মনে গীতসুধা পানে রত, এমন সময়ে একজন পুষ্টপেশী বলিষ্ঠ স্বাস্থ্যকামী লেঙটধারী ব্যক্তি কক্ষে প্রবেশ ক'রে যদি সঙ্গীত-আসরের অনতিদূরে মেঝেতে দাঁড়িয়ে হাঁইও-হুঁইয়ো রবে ডন্-বৈঠক আরম্ভ করে, তা হ'লে ডন্-বৈঠকের ওঠা-বসার সহিত ভূপালী রাগের আরোহ-অবরোহ মৈত্রী স্থাপন করতে অসমর্থ হওয়ায় কক্ষের সঙ্গীত-পরিবেশ ছিন্ন হ'য়ে যায়।

ডন্-বৈঠক ত' উগ্র ব্যাপার, সঙ্গীত-আসরের পক্ষে নিশ্চয়ই তা উপদ্রব। কিন্তু সেই লেঙটধারী ব্যক্তি যদি ধুতি-জামা পরিধান ক'রে ডন্-বৈঠকের পরিবর্তে সেই কক্ষের এক কোণে টেবিল চেয়ার নিয়ে ব'সে হাইড্রোস্ট্যাটিক্সের দুরূহ অঙ্ক কষায় নিমগ্ন হয়, তা হ'লেও তা সঙ্গীত-

আসরের পক্ষে, উপদ্রব যদি একান্তই না হয়, অন্যুগ্র উৎপাত হ'য়ে দাঁড়ায়। হাইড্রোস্ট্যাটিক্স্ যেখানে বারোজন লোকের মধ্যে একটি লোককে ভূপালী রাগের সুরবেষ্টন হতে সরিয়ে রাখতে পেরেছে, সে আসরে ভূপালী রাগের মহিমা ক্ষুণ্ণ হয়েছে বলতেই হ'বে। বারোটি যন্ত্রের ঐকতান বাদনে এগারটি যন্ত্র যদি সুরে বাজে এবং একটি বেসুরে, তা হ'লে সে বাদন আর ঐকতান বাদন থাকে না।

আমাদের তিনজন বৈঠকীর মধ্যে দু'জন ছিলেন কবি, আর তৃতীয় ব্যক্তি কাব্যরসিক। সুতরাং বৈঠক সুর হারায়নি, যেমন সুর হারায় না তিনজনের সেই বৈঠক, যে বৈঠকে দুজন সন্দেশনির্মাতা, আর আর-একজন সন্দেশবিলাসী।

বৈঠকের দ্বিতীয় ব্যক্তি যখন প্রস্থান করলেন তখন মধ্যাহ্ন উত্তীর্ণ হয়েছে। স্নানাহারের জন্য উঠ্‌ব উঠ্‌ব করছি, এমন সময়ে কক্ষে প্রবেশ করলে বিষ্ণু নাগ।

খুসি হয়ে বললাম, স্বাগত!

একটা চেয়ারে উপবেশন ক'রে বিষ্ণু নাগ বললে, "কিন্তু রবিবারের বৈঠক এরই মধ্যে একেবারে যে শূন্‌শান্!"

বললাম, "তোমার শুভ প্রবেশ যখন হয়েছে, তখন আর শূন্‌শান্ কোথায়? শূন্য ত তুমি পূর্ণ করলে।"

বিষ্ণু নাগ বললে, "করলাম কি-না জানিনে, কিন্তু ধর, যদি ক'রেই থাকি, তা হ'লে ক'জনের করলাম শুনি?"

বললাম, "বেশি নয়, দুজনের। আজ শুধু ক-বাবু আর স-বাবু এসেছিলেন। কিন্তু তিনজনের আড্ডার গভীরতা তার বিস্তারের অভাবকে পুষিয়ে দিয়েছিল। একটা কৌতূহলোদ্দীপক প্রশ্ন উঠে শীর্ণ জমায়েৎকে করেছিল জম্‌জমে।"

"কি সে প্রশ্ন?"

"প্রশ্ন ছিল, লেখকের সৃষ্টি লেখকের বয়সের পরিমাণকে মেনে চলতে বাধ্য কি-না।"

বিষ্ণু নাগ বললে, "উক্তিটির প্রসঙ্গ নির্দেশ ক'রে ব্যাখ্যা কর।"

বললাম, "করি। আমার একটা নূতন গল্পের বই ছাপাখানায় যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। কোনো প্রসঙ্গে তার একটি গল্প ক-বাবু বৈঠকে পাঠ করে শোনালেন। গল্পটি এক উচ্চশিক্ষিত কিন্তু উগ্রখেয়ালী যুবকের দুঃসাহসিক প্রণয়-অভিযানের রোমাঞ্চকর কাহিনী। বিষয়বস্তুর অনুরোধে গল্পটি সরস। পাঠ শেষ ক'রে ক-বাবু গল্পটির প্রশংসা করলেন; কিন্তু বললেন, গল্পটি যে আমার পূর্বকালের রচনা সেটা গল্পের প্রথম পৃষ্ঠার ফুটনোটে উল্লেখ করলে ভাল হয়।"

উত্তরে আমি বললাম, "তেমন কথা ফুটনোটে উল্লেখ করা দুটি কারণে অসমীচীন হবে। প্রথমতঃ, ও গল্পটি পূর্বকালের, অর্থাৎ আমার যৌবন কালের রচনা নয়, মাত্র বৎসর দেড়েক আগে লিখেছিলাম; দ্বিতীয়তঃ, আমার বয়সের লেখকের পক্ষে সরস প্রণয় কাহিনী রচনার বিরুদ্ধে কোন নৈতিক কারণ নেই, সুতরাং সে বিষয়ে আমার কোনো কুণ্ঠা অথবা কৈফিয়ৎ থাকতে পারে ব'লে আমি মনে করিনে; কারণ রস-অবতারণার ক্ষেত্রে লেখকের বয়স অপ্রাসঙ্গিক বস্তু, পাঠকের বয়সই প্রাসঙ্গিক।"

বিষ্ণু নাগ বললে, "ঠিক যেমন চিনির রসের ক্ষেত্রে ময়রার স্বাস্থ্য অপ্রাসঙ্গিক বস্তু, ক্রেতার স্বাস্থ্যই প্রাসঙ্গিক। বহুমূত্র রোগাক্রান্ত কোনো ময়রার পক্ষে চায়ে চিনি নিষিদ্ধ এবং স্যাকারিন বিধেয় ব'লে সে যে খদ্দেরের সন্দেশেও চিনির পরিবর্তে স্যাকারিন ব্যবহার করবে তার কোনো যুক্তি নেই।"

বললাম, "কিন্তু ক-বাবুর হয়ত' ঠিক এই কথাটাই বলবার অভিপ্রায়

ছিল না। চুয়াত্তর বৎসর বয়স্ক লেখকের গল্পের নায়ককে বাহাত্তর বৎসর বয়স্ক এবং নায়িকাকে আটষট্টি বৎসর বয়স্কা হ'তে হ'বে, অথবা দুজনে তরুণ-তরুণী হ'লেও লেখকের বয়সের ছোঁয়াচ লেগে উভয়কে বার্ধক্য ভাবাপন্ন এবং সংযতবাক হ'তে হ'বে, যৌবনোচিত কোনো উচ্ছলতাই তাদের থাকবে না, এমন ইঙ্গিত তিনি নিশ্চয়ই করেন নি। তাঁর হয়ত' বলবার উদ্দেশ্য ছিল লেখকের বয়োবৃদ্ধির সহিত লেখার তাল বজায় রাখতে পারলে ভাল হয়।"

মাথা নেড়ে বিষ্ণু নাগ বললে, "এ কথাও একেবারে ঠিক নয়। জাত-লেখক হচ্ছেন তিনি, যিনি সৃষ্টির অপরিবর্তনশীল রসপদ্মের উপর চিরদিন কায়েম থাকতে পারেন। তুমি নিজে লেখক ব'লে লেখকের কথাই কেবল বলছ, কিন্তু জাত-লেখকের মতো জাত-পাঠকেরও বয়সের বালাই নেই, সে কথাও জেনো। যে জাত-পাঠক সে যেমন দুর্মদ যৌবনকালে 'অনাদিমধ্যান্তমনন্ত বীর্যম্, অনন্তবাহুং শশীসূর্যনেত্রম, পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্ত্রম, স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্' পাঠ ক'রে রসের সন্ধান পায়, তেমনি স্তিমিত বার্ধক্যের দিনেও 'সমাজ-সংসার মিছে সব, মিছে এ জীবনের কলরব, কেবল আঁখি দিয়ে আঁখির সুধা পিয়ে হৃদয়ে দিয়ে হৃদি অনুভব' প'ড়ে আনন্দ লাভ করে। জীবনব্যাপী রসলোক তার কাছে নিত্য সনাতন অপরিবর্তনশীল সংস্থা।"

বললাম, "তোমার এ মন্তব্যের বিরুদ্ধেও কিন্তু কিছু তর্ক করা যেতে পারে।"

বিষ্ণু নাগ বললে, "তা হয়ত' পারে, কিন্তু আজ আর নয়, বিশদভাবে অন্য কোনও দিন করা যাবে। আজ আরম্ভ করলে ঘরের কর্ত্রী রুদ্রমূর্তি হ'য়ে হয়ত' বলবেন—থাকুক তোমার স্নান ও আহার বিষ্টুরে নিয়ে থাকো।"

স্মিত মুখে বললাম, "বিষ্টুরে নিয়ে থাকো, গৃহকর্ত্রী বলতে পারেন ; কারণ তুমি যে আমার কত আপনার সে কথা বোঝেন তিনি।"

ওষ্ঠে অঙ্গুলি স্থাপন ক'রে বিষ্ণু নাগ বললে, "চুপ।" তারপর হাসতে হাসতে উঠে পড়ল।

(ক্রমশঃ)

—"আমি ঈশ্বরের দাস, আমি ঈশ্বরের ছেলে, যদি অহঙ্কার করতে হয়, তো এই অহঙ্কার কর। এই রকমে ছয় রিপুর মোড় ফিরিয়ে দিতে হয়। তাঁর যদি একবার কৃপা হয়, ঈশ্বরের যদি একবার দর্শনলাভ হয়, আমার যদি একবার সাক্ষাৎকার হয়, তাহলে আর কোন ভয় নাই—তখন ছয় রিপু আর কিছু করতে পারবে না। ছয় রিপুকে ঈশ্বরের দিকে মোড় ফিরিয়ে দাও। আত্মার সহিত রমণ করা, এই কামনা। যারা ঈশ্বরের পথে বাধা দেয় তাদের উপর ক্রোধ। তাঁকে পাবার লোভ, 'আমার, আমার' যদি করতে হয়—তবে তাঁকে লয়ে। যেমন আমার কৃষ্ণ, আমার রাম। যদি অহঙ্কার করতে হয় তো বিভীষণের মত। 'আমি রামকে প্রণাম করেছি—এ মাথা আর কারু কাছে অবনত করবো না।' যদি ঈশ্বরের পাদপদ্মে একবার ভক্তি হয়, যদি তাঁর নাম গুণগান করতে ভালো লাগে, ইন্দ্রিয় সংযম আর চেষ্টা করে করতে হয় না। রিপু বশ আপনা আপনি হয়ে যায়।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

আশীষ গুপ্ত

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

১৫

আনন্দর সহিত বিজয়ের মা মহামায়া, বিজয় এবং সুজাতার সকল আলোচনাই ব্যর্থ হইল। আনন্দ তাহার প্রাথমিক সিদ্ধান্ত পরিবর্ত্তনের কোন প্রয়োজন অনুভব করিল না। অবশেষে ক্ষুণ্ণ হইয়া বিজয় বলিল, "কয়েকদিন হল আমি মনে মনে ভাবছিলাম যে তুই যদি স্থায়িভাবে আমাদের এখানে থাকিস তাহলে তোকে আমার কারবারের অংশীদার করে নিতে পারলে সুবিধে হয়। কাজকর্ম্ম বেড়ে যাচ্ছে অথচ নির্ভর-যোগ্য মানুষের অভাব। তোর মতন লোক পেলে আমি এ কারবারে সোনা ফলাতে পারি। তোকে পড়াশুনা ছাড়তে হবে না, মাষ্টারিও ছাড়তে হবে না। অবসর সময়ে আমার লোকজনের কাজের পরিমাণ, এবং টাকাকড়ির সাধারণ হিসাবপত্র, পরীক্ষা করে দেখলেই আপাতত যথেষ্ট।"

বিজয়ের কথা শুনিয়া আনন্দর আর বিস্ময়ের অবধি রহিল না। তাহার বিমূঢ় অবস্থা দেখিয়া অসহিষ্ণুকণ্ঠে বিজয় বলিল, "ওরকম আহাম্মকের মত হাঁ করে তাকিয়ে থাকিসনে বাপু। এমন কিছু অসম্ভব কথা আমি বলিনি। আর আমার বলাবলিতেই বা কি

আসে যায়! তুই তো এরই মধ্যে গাঁটরি-বোঁচকা বাঁধবার তাল করে বসে আছিস্!"

আনন্দর বিস্ময়ের ঘোর তখনও সম্পূর্ণ কাটে নাই। কিছুকাল হতবাক থাকিয়া সে কহিল, "তোমাকে বুদ্ধিমান বলে মনে করেছিলাম বিজয়! কিন্তু এখন দেখছি যে আমি নিজে জ্ঞানহীন বলে তোমার বুদ্ধিসম্পর্কেও অজ্ঞানের মতনই সিদ্ধান্ত করেছিলাম! ঠিকেদারী ব্যবসাতে তোমার সহকর্মী হবার যোগ্যতা আমার আছে, এমনতর অদ্ভুত কথাও যখন তুমি চিন্তা করতে পেরেছ তখন তুমি যে একান্ত সরলপ্রকৃতির মানুষ এবং আমার পূর্ব্বসিদ্ধান্ত যে একেবারেই ভুল তাতে সংশয় নেই!"

সকৌতুকে বিজয় বলিল, "আমার বুদ্ধির পরিচয় মিলবে আমার ব্যাঙ্কের হিসেবের খাতায়। কিন্তু তুমি ওই কাজের যোগ্য হবে কিনা এ প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে এই যে আমার মতে যে লোক মনে প্রাণে সৎ, তার পক্ষে কোন ব্যবসাই মূলত কঠিন নয়। চেষ্টা করলে সে লোক সব ব্যবসা সম্পর্কেই মোটামুটি খানিকটা শিখতে পারে। কর্ম্মদক্ষতা নিশ্চয়ই দরকার, কিন্তু আন্তরিকতা তার চেয়েও বেশী দরকার। আর আন্তরিকতার সঙ্গে যে কাজ করে, সে যদি কর্ম্মদক্ষ হয় তাহলে তো সোনায় সোহাগা! তোমার মধ্যে সেরকম সম্ভাবনা আছে বলেই আমি বিশ্বাস করি। শেলী-কীটস পড়ে স্বপ্নবিলাসী হয়ে উঠেছ বলে তুমি আমার রাজমিস্ত্রীদের 'হপ্তা' মেলাতে পারবে না, এটা নিশ্চয়ই কোন যুক্তির কথা নয়।—প্রথম প্রথম হয়তো অসুবিধা একটু হবে, কিন্তু শেষ অবধি যাবে সব ঠিক হয়ে। গেরস্ত বাড়ীর পোষা বেরাল যে বনে গিয়ে বনবেরাল হয় সে কথা তো সবাই জানে!"

প্রত্যুত্তরে করুণামিশ্রিত দৃষ্টিতে বিজয়ের দিকে চাহিয়া আনন্দ

কহিল, "বিজয়, সত্যিই তুই বড় ভালো মানুষ! অর্থাৎ আজকালকার দিন হিসেবে—কিছু যেন মনে 'করিসনি একথা বলছি বলে—একটু বোকা!"

* * *

মন স্থির হইয়া গেছে, বাহির হইয়া পড়িতে হইবে। আর উত্তরপাড়ায় থাকা নয়। সহজ জিনিস ঘোরালো হইয়া ওঠে এখানে, বিশেষ সুবিধার জায়গা নয় এটা। কলিকাতার তপ্ত খোলা হইতে অব্যাহতি পাইতে গিয়া সে যে উত্তরপাড়ার অগ্নিকুণ্ডে সরাসরি লাফাইয়া পড়িয়াছে, ইহা উপলব্ধি করিয়া আনন্দ শঙ্কিত হইল। বেশ কিছুটা বিলম্ব হইয়া গেছে, ইহার পূর্ব্বেই চলিয়া যাওয়া উচিত ছিল। নিজের দৈহিক ও মানসিক আলস্যকে প্রশ্রয় দিয়া সাতদিনকে টানিয়া আঠারো দিন করা তাহার পক্ষে একেবারেই সঙ্গত হয় নাই। কিন্তু যাহা হইবার তাহা তো হইয়াছে, এখন কাল সকালে চা-পান পর্ব্ব সমাধা করিয়াই রওনা হইতে পারিলে হয়। আজ অপরাহ্ণে বিদায় গ্রহণ করিলেই ভালো হইত, কিন্তু কিছুক্ষণ পূর্ব্বে মহামায়া, সুজাতা এবং বিজয়ের সহিত যে সকল কথাবার্ত্তা হইয়াছে তাহাতে এমন করিয়া সাত-তাড়াতাড়ি আজই চলিয়া গেলে চরম অসৌজন্য প্রকাশ পায়, সুতরাং বাধ্য হইয়াই আগামী কাল প্রত্যুষের অপেক্ষায় থাকিতে হইল।

* * *

বইখাতা ঠিক করিতে গিয়া আনন্দর স্মরণ হইল চিত্রশিল্প সম্বন্ধে অনুরাধার একখানা দামী বই শচিদার কাছে রহিয়াছে। উত্তরপাড়া ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে অনুরাধার বই অনুরাধাকে প্রত্যর্পণ করা প্রয়োজন।

শচীনের সহিত আনন্দর প্রথম পরিচয় হয় কলেজে। আনন্দ যখন

ফার্ষ্ট ইয়ারে পড়ে, তখন শচীন পড়িত থার্ড ইয়ারে। কলেজের লাইব্রেরীতে বই পড়িতে গিয়া দু'জনের প্রথম আলাপ।

উত্তরপাড়ায় আসার দু'দিন পরে স্টেশনের কাছে হঠাৎ শচীনের সহিত সাক্ষাৎ। "কলকাতা ছেড়ে এখানে কি করছ আনন্দ?" বলিল শচীন।

"কিছু না শচিদা। দু'দিন হল বেড়াতে এসেছি এখানে।"

"উঠেছ কোথায়?"

"বিজয়দের বাড়ী। আমার বন্ধু বিজয় বসু,—তাদের ওখানে।"

"বুঝেছি। ভবেশ বোসের ছেলে তো?—নামে চিনি ওকে। বিজয় আগে খুব রাজনীতি করত, জেলটেলও খেটেছিল। সেইজন্যই নাম শুনেছি তার।"

"আপনি কি করছেন শচিদা আজকাল?"

"বর্ত্তমানে বেকার-জীবনযাপন। এম-এ পাস করে একটা প্রোফেসারী বাগাবার চেষ্টায় আছি উত্তরপাড়া কলেজে। ভরসা পেয়েছি হয়ে যাবে। তাহলে বাড়ীর খেয়ে যা দু'চার টাকা পাই তাইতেই চা সিগারেটের খরচটা উঠে যাবে।" বলিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "কিন্তু একেবারে যে কিছু করছিনা তা-ও ঠিক নয়। বাজারের মধ্যে আমাদের একটা বইয়ের দোকান আছে, প্রায় পঞ্চাশ বছরের দোকান, ঠাকুরদাদার আমলের, নাম "বেঙ্গল বুক কোম্পানী" তার। ম্যানেজার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাস ঘোষ মহাশয়ের অধীনে কাজ করি দুপুর-বেলা। আমাদের বহুদিনের পুরোন কর্ম্মচারী সতীশবাবু।—উনিই হলেন দোকানের সর্ব্বেসর্ব্বা। বাবা গিয়েছেন মধুপুর হাওয়া বদল করতে। যাবার সময়ে সতীশবাবুকে ভার দিয়ে গিয়েছেন আমাকে একটু একটু করে বইয়ের দোকানের কাজকর্ম্ম শিখিয়ে 'মানুষ' করতে এবং দিনের

শেষে আমাকে পারিশ্রমিকরূপে বারো আনা পয়সা দিতে দোকানের হিসেব থেকে! অতএব ঠিক একেবারে বেকার নই আমি।"

"তাহলে আমি আপনাদের বইয়ের দোকানে আসব একদিন শচিদা।"

"নিশ্চয়ই আসবে। দোকানে আসবে, বাড়ীতেও আসবে। বাড়ীতে এলে কিন্তু সন্ধ্যের পর আসবে। সকালে আমি ঘুমোই একটু বেশী বেলা অবধি।" বলিয়া বাড়ীর ঠিকানা দিয়া শচীন প্রস্থান করিল।

তাহার পর এই কয়দিন শচীনের সহিত আনন্দর প্রায় প্রত্যহই দেখা হইয়াছে। কখনও লাইব্রেরীতে, কখনও "বেঙ্গল বুক কোম্পানী"তে, কখনও বা শচীনের বাড়ীতে এবং দু'তিন দিন বিজয়ের ওখানে। আনন্দর সহিত সাক্ষাতের জন্য শচীন শেষ যেদিন বিজয়দের বাড়ীতে আসিয়াছিল সেই সময় অনুরাধার বইখানা সে চাহিয়া লইয়া যায় আনন্দর কাছ হইতে। সেই বই অবিলম্বে উদ্ধার করা প্রয়োজন। —আনন্দ জামাকাপড় বদলাইয়া "বেঙ্গল বুক কোম্পানীর" উদ্দেশ্যে রওনা হইল।

* * *

দোকানের সম্মুখে রাস্তার দিকে ছাদের কাছে কতকগুলা চটের পর্দা ঝুলিতেছিল—তাহার ভিতর হইতে একটা বিশ্রী পচা ভ্যাপ্‌সা গন্ধ সর্ব্বদা নাকে আসে। কি উদ্দেশ্যে ওই চট ওখানে প্রথম ঝুলানো হইয়াছিল সেকথা শচীনও জানিত না। শুধু একদিন দুর্গন্ধ কোথা হইতে আসিতেছে আনন্দর এই প্রশ্নের উত্তরে দেকার্ত্-এর দার্শনিক গ্রন্থ হইতে মুখ না তুলিয়াই ছাদের দিকে আঙুল দেখাইয়া বলিয়াছিল, "ওখান থেকে। তবে গন্ধ কেন বেরোচ্ছে এবং চট ওখানে কেন ঝোলান হয়েছে সেটা সতীশবাবুকে জিজ্ঞেস কর!"

দোকানের ভিতরে গোটা দশেক আলমারা। তাহাদের কোনটার কাচ আছে, কোনটার নাই। যাহাদের কাচ আছে, সেই কাচের উপরকার ধূলার পুরু আবরণ ভেদ করিয়া তাহাদের ভিতরের পরিপূর্ণ শূন্যতা চোখে পড়ে না! ঘরের মাঝখানে একটা অতিশয় ভারী, পুরাতন প্যাটার্ণের জরাজীর্ণ টেবিল। বছর তিরিশ চল্লিশ ধরিয়া পর্ব্বতপ্রমাণ পুস্তকের ভার বহন করার ফলে তাহার মাঝখানটা বসুমতীর কেন্দ্রানুগ হইয়া উঠিয়াছে। চারখানা হাতলশূন্য চেয়ার, পুরু ভারী কাঠের তৈরী তাহাদের পায়া।—সবগুলা পায়া যে যথাস্থানে বর্ত্তমান তাহা নহে। সংসারে আত্মরক্ষার যতগুলি কৌশল আছে সবগুলি খাটাইয়া তবে ওই চেয়ারে উপবেশন করা চলে!—সমস্ত ঘরটা ইঁদুর, চামচিকা ও ছুঁচোর দুর্গন্ধ এবং কলরবে যেমন অপরিচ্ছন্ন তেমনই গ্লানিকর। শ্রীযুক্ত সতীশ-চন্দ্র দাস ঘোষ এই সুপ্রাচীন প্রতিষ্ঠানের প্রধান তত্ত্বাবধায়ক। যেমন বিশ্বাসী, তেমনই নাকি কর্ম্মঠ! ওই আলমারী, চেয়ার এবং এমন কি দোদুল্যমান চটগুলার অপেক্ষাও এই দোকানের সহিত সতীশবাবুর পরিচয় ঘনিষ্ঠতর। শচীন ইঁহারই নিকট শিক্ষানবিসি করিতেছে।

আনন্দ দোকানের সম্মুখে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "শচিদা এসেছেন?"

একটা নস্যিমোছা অপরিচ্ছন্ন ন্যাকড়ায় নাক ঝাড়িয়া সতীশবাবু কহিলেন, "না—"

"কখন আসবেন বলতে পারেন?"

"না। লাটসাহেব বোধ হয় এখনও ঘুমোচ্ছেন।" বলিয়া তিনি দোকানের বলাই নামক কর্ম্মচারীটির সহিত কি একটা প্রয়োজনীয় আলোচনায় মগ্ন হইয়া গেলেন।

আনন্দ প্রশ্ন করিল, "এগারোটা অবধি ঘুমোচ্ছেন কি রকম?"

কোন সাড়া মিলিল না। ভারী অপ্রস্তুত বোধ করিতে লাগিল আনন্দ। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "দুপুরবেলা এলে দেখা হবে কি না বলতে পারেন?"

সতীশবাবু যে কানে এত কম শোনেন সে কথা আনন্দর একেবারেই জানা ছিল না। ভাবিল, হইবেও বা, এতদিনের পুরানো কর্ম্মচারী,—কাজকর্ম্মের গুরুভারে কানে হয়তো কম শোনেন, অথবা আত্মরক্ষার জন্য কম শোনার ভান করেন, সুতরাং জোর গলায় কথা বলাই ভালো! আনন্দ এইবার চীৎকার করিয়া বলিল, "শচিদার সঙ্গে দুপুরবেলা দেখা হবে কিনা বলতে পারেন?"

উত্তরে সতীশবাবু মুখ তুলিয়া চাহিয়া কঠোরভাবে বলিলেন, "কানে শুনতে পাই।"

অপ্রতিভ কণ্ঠে আনন্দ বলিল, "আমি তা ভেবে বলিনি।"

"তবে কি ভেবে শুনি?" একেবারে ঝাঁজাইয়া উঠিলেন সতীশচন্দ্র দাস ঘোষ।

"শচিবাবুর কথা তিনিই বলতে পারেন। দুপুরবেলা একবার চেষ্টা করবেন যদি তাঁর দেখা পান।" বলিয়া সতীশবাবু পুনরায় বলাইয়ের সঙ্গে কথাবার্ত্তায় ডুবিয়া গেলেন।

বিরক্ত হইয়া আনন্দ বাড়ী ফিরিল।

—বইটা ফেরত পাওয়া অত্যাবশ্যক। অতএব পুনরায় বেলা দুইটার সময় সে "বেঙ্গল বুক কোম্পানী"তে আসিয়া হাজির হইল। ভাঙ্গা টেবিলের উপর মাথা রাখিয়া বলাই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। নস্যি নাকে দিয়া সতীশবাবু ঝিমাইতেছিলেন। নস্যির রস নাসারন্ধ্রের সীমানা অতিক্রম করিয়া ঠোঁটের উপর দিয়া গড়াইয়া আসিয়া উন্মুক্ত বদনবিবরের

দন্তপংক্তি অবধি পৌঁছিয়াছিল। আনন্দ জিজ্ঞাসা করিল, "শচিদা এসেছিলেন ?"

সতীশবাবুর নিকট হইতে কোন উত্তর পাওয়া গেল না। নিজেকে অতিশয় ক্ষুদ্র মনে হইতে লাগিল আনন্দর। কিন্তু বইটার প্রয়োজন গুরুতর। অতএব এবার অপেক্ষাকৃত উচ্চকণ্ঠে বলিল আনন্দ, "শচিদা এসেছিলেন ?"

চমকিয়া উঠিয়া সতীশবাবু কহিলেন, "কে ?" বলিয়াই সচেতন হইয়া বলিলেন, "না, না, অন্য দোকানে যান। 'ফার্ষ্ট বুক' আমাদের নেই।"

রুষ্টমুখে আনন্দ কহিল, "শুধু 'ফার্ষ্ট বুক' কেন, কোন 'বুক'ই যে আপনাদের এখানে নেই তা রাস্তায় দাঁড়িয়েই টের পাওয়া যায়, কাউকে জিজ্ঞেস করবার দরকার হয় না! আর আমি তা জানতেও চাইনি। আমি জিজ্ঞেস করছিলাম শচিদা এসেছিলেন কিনা সেই কথা।"

এই রূঢ় ভাষণের ফলে সতীশবাবুর অর্দ্ধনিমীলিত চোখের পাতা দুইটা পদ্মদলের ন্যায় উন্মুক্ত হইল। রক্তজবাসদৃশ নয়নের পূর্ণদৃষ্টি আনন্দর মুখের 'পরে সংস্থাপিত করিয়া সক্রোধভাবে সতীশবাবু কহিলেন, "শচী ? কই সে তো এখনও আসেনি।"

আনন্দ চিন্তিত হইল। বইটা আজ না পাওয়া গেলে কি যে অসুবিধায় পড়িতে হইবে! এদিক-সেদিক ঘুরিয়া সে পুনরায় বেলা তিনটার সময় দোকানের সম্মুখে পায়চারী করিতে লাগিল। রাস্তা হইতেই দেখা গেল বলাই ঘুমাইতেছে এবং সতীশবাবুও সেই একইভাবে ঝিমাইতেছেন। আনন্দ ভাবিল দোকানে ঢুকিয়া আর দরকার নাই! শচিদা যে ওখানে নাই তাহা তো দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে। যদি তিনি ইতিমধ্যে আসিয়া চলিয়া গিয়া থাকেন তাহা হইলে তো গোলমাল

ঢুকিয়াই গেছে। আর যদি এখন পর্যান্ত না আসিয়া থাকেন তাহা হইলে আর ওই সতীশচন্দ্র দাস ঘোষ নামধারী কিম্ভূতকিমাকার জীবটিকে জিজ্ঞাসা করিয়া কি এমন লাভ হইবে?—মানসিক যুক্তিটা সব দিক দিয়াই নিখুঁত হইল। অতএব সতীশবাবুর সাধের ঝিমানি ভাঙ্গাইতে আর তাহার প্রবৃত্তি হইল না।

চিন্তাকুলচিত্তে আনন্দ দোকানের সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিল। বহুক্ষণ হইতেই বলাই হাঁ করিয়া ঘুমাইতেছিল। মুখের লাল টেবিলের উপর গড়াইয়া পড়িয়া প্রায় দানা বাঁধিবার উপক্রম হইয়াছিল! বইয়ের দোকানের ক্রেতার পক্ষে মনোমুগ্ধকর দৃশ্যই বটে!—সতীশবাবু কিন্তু ঘুমের মধ্যে ঢুলিতে ঢুলিতেও খানিকটা সচেতনতা বজায় রাখিয়াছিলেন। আনন্দ একবার মনে করিল দোকানে ঢুকিয়া একটা কাঠি দিয়া তাঁহার নাকে সুড়সুড়ি দেয় এবং দুই আঙুল দিয়া জোর করিয়া বলাইয়ের মুখের হাঁ বন্ধ করিয়া আসে! কিন্তু সেক্ষেত্রে সতীশবাবুর সহিত পরবর্ত্তী সঙ্ঘর্ষের কথা চিন্তা করিয়া সে তাহার সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করা সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করিল না।

* * *

অপরাহ্ণ পাঁচটার সময় আনন্দ যখন আবার "বেঙ্গল বুক কোম্পানী"তে উপস্থিত হইল তখন বলাই এবং সতীশবাবুর, দুজনেরই, নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে। আনন্দকে দেখিয়াই এইবার সতীশবাবু ব্যস্তসমস্তভাবে অভ্যর্থনা করিলেন, "আসুন আনন্দবাবু।"

বলাইকে বলিলেন, "একটু চা নিয়ে এসো তো বলাই আনন্দবাবুর জন্যে।"

সাহস পাইয়া আনন্দ তাহার চিরন্তন প্রশ্ন উত্থাপন করিল, "শচিদা এসেছিলেন?"

"না, আসেনি। আর সে আজ আসবে না। কলকাতায় গেছে একটা বিশেষ কাজে। বাড়ী থেকে চাকর এসেছিল, খবর দিয়ে গেল।" বলিলেন সতীশবাবু।

শুনিয়া নিদারুণ বিরক্তিতে আনন্দর চিত্ত পূর্ণ হইয়া গেল। শচীনের সহিত কাল সকাল দশটার পূর্ব্বে দেখা হওয়া সম্ভবপর নয়। সুতরাং যদি বই আদায় করার পর তাহাকে কলিকাতা রওনা হইতে হয়, তাহা হইলে কাল প্রত্যূষে উত্তরপাড়া ত্যাগ করার সম্ভাবনা নাই। অথচ বইটা অনুরাধাকে ফিরাইয়া না দিয়াই বা সে নড়ে কেমন করিয়া! শেষ অবধি দেখা যাইতেছে কাল অপরাহ্ণের পূর্ব্বে তাহার যাওয়া হইবে না!

একান্ত অপ্রসন্ন মুখে আনন্দ "বেঙ্গল বুক কোম্পানী"র ভাঙ্গা চেয়ার আশ্রয় করিয়া বসিয়া রহিল।

[ক্রমশঃ]

—"সর্প অতি বিষাক্ত, তাহাকে ধরিতে যাইলে তখনি দংশন করে, কিন্তু যে ব্যক্তি ধূলাপড়া শিখিয়াছে, সে সাপ ধরা কি, সাতটা সাপ গলায় জড়াইয়া খেলিতে পারে। সেইরূপ যে জ্ঞান লাভ করিয়াছে সে কামিনী-কাঞ্চনের মধ্যে থাকিলেও তাহার কিছুই হয় না।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ